KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩০/- ৩০/- ৩১/- ৩১/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৮৯ // May 1982 কার্তিক ১৩৮৯ // Nov 1982 বৈশাখ ১৩৯০ // May 1983 কার্তিক ১৩৯০ // Nov 1983
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একত্রিংশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

First and last–
it's always been
our people.

75
TATA STEEL

TATA STEEL

HTC-7115-4648

অভিধান গ্রন্থমালা

O সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ॥ প্রায় সাড়ে-তিনহাজার জীবনী-সংবলিত আকরগ্রন্থ [৪০·০০]

O সংযোজন খণ্ড : সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ॥ আরও কিছু জীবনী-সন্নিবিষ্ট [১০·০০]

O বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সংকলিত ও সম্পাদিত। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। [প্রতি খণ্ড ৫০·০০]

O সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

অহরহ ব্যবহারের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ অভিধান। [২৫·০০]

O SAMSAD ENGLISH–BENGALI DICTIONARY

পঞ্চম সংস্করণ। পূর্ণাঙ্গ অভিধান। [৪২·৫০]

O SAMSAD BENGALI–ENGLISH DICTIONARY

সর্ববৃত্তিধারীর উপযোগী অভিধান [৩২·৫০]

O SAMSAD STUDENTS

ENGLISH-BENGAEI DICTIONARY [১৮·০০]

O SAMSAD COMMON WORDS DICTIONARY [ENG-BENG] [১২·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

একত্রিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা কার্তিক তেরশ নব্বই

স

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

বাউল সাধনা ।। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ৪১

রামায়ণে আয়ুর্বেদের শল্যশালাক্য বিদ্যার ছাপ ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ৪৯

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ ।। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪

হরিনামামৃত ব্যাকরণ ।। কালীজীবন দেবশর্মা ৬১

সমালোচনা : গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৭৩

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুনীল প্রিণ্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

সমকালীন

বর্ষ ৩১ কার্তিক ১৩৯০

বাউল সাধনা

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন

বাউল-সাধনা একটা অধ্যাত্ম-সাধনা। এর ইতিহাস আমি জানিনে। আর এর ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন ভারতবর্ষের আর্য ও অনার্য অধ্যাত্ম-সাধনার কথা জানা দরকার। আমার সে ক্ষমতা নেই। প্রাচীন আর্য অনার্য ভাষা কোনটাতেই আমার দখল নেই। বাউল-সাধনা একটি ধর্ম-সাধনা।

এই সম্পর্কে একটি কথা আমার মনে হয়। ইসলাম ধর্মের অঙ্গ থেকে জন্ম নিয়েছে সুফী সাধনা। ইসলাম-বৃক্ষের কাণ্ড শরিয়তী বা আচারনিষ্ঠ ইসলাম। এর পুষ্প-সম্ভার সুফী-সাধনা। এই সুফী-সাধনার মূল কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ Iganz Goldzihee বলেন যে মুসলমান খলিফাদের বিলাস ও জগৎপ্রিয়তা একদল চিন্তাশীল লোকের মনে সংসার ত্যাগের ও অধ্যাত্ম-সাধনায় দীক্ষা গ্রহণে ব্রতী করে। এঁরা রাষ্ট্রশক্তির মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে নির্জন সাধনায় কম্বলের বস্ত্র এবং আহার্য বস্তু গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হন। কেহ কেহ বলেন এই বস্ত্র হ'তে তাঁদের নাম সুফী। সুফ শব্দ বলতে মোটা পশমের বস্ত্র বুঝায়। এই সম্পর্কে বাউলদের শত তালিযুক্ত আলখাল্লাও যে প্রকার বিলাসের বিরুদ্ধে জয়ধ্বজা উড়ায়,—বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাউলদের পোষাক এবং সুফীদের পোষাক উভয়ই এক শ্রেণীর পোষাক। আমার মনে হয় এই পোষাক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পোষাক থেকে গৃহীত। এই দীর্ঘ পোষাক বোধ হয় সে যুগের ভদ্র পোষাক ছিল। ভারত, চীন, জাপান, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান, ইরাণ প্রভৃতি দেশে এই দীর্ঘ আলখাল্লা

সাধুদের দরবেশদের পোষাকরূপে গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পোষাক হরিদ্রাবর্ণের ছিল। মুসলমান দরবেশদের পোষাক সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাউলদের একটা বৈশিষ্ট্য, এরা নরসুন্দরের আদৌ ধার ধারে না। ক্ষৌর কার্য এরা করে না। সহজভাবে এরা জীবনযাত্রায় পক্ষপাতী বলেই কেশ, গুম্ফ এবং শ্মশ্রুর সংস্কারের পক্ষপাতী নয়।

আর এদের প্রধান ধর্ম হচ্ছে উদাসীনতা। এদিক দিয়ে সকল দেশের মরমীয়াবাদীদের মত বাউলও উদাসীন। সুফীরাও উদাসীন। সুফীরা নির্জনতাপ্রিয়। বৌদ্ধ শ্রমণদের মত বাউলরাও নিরন্তর ভ্রমণশীল, সুফীরাও ভ্রমণশীল। বাউলরা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক এবং প্রধানতঃ মনের মানুষরূপেই ঈশ্বরকে জানবার সাধনা। "ঈশ্বরের আসন বিশ্বাসী মানুষের হৃদয়" মুসলমান ধর্মগুরুর এই উক্তি লক্ষণীয়।

বাউলেরা সহজ জীবনযাত্রার পক্ষপাতী। এই জীবন ধারণ আমার মনে হয় বৌদ্ধধর্ম প্রসূত। বাউলদের জীবনের বড় আশ্রয় বৌদ্ধ সহজ যান, বৈদিক ব্রাত্য এবং বাঙ্গালার বাউল উভয়ই একধর্মী। অর্থাৎ আচারের মরা বালুরাশি এদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মগধের ব্রাত্য এবং বঙ্গের বাউল একই বিদ্রোহধর্মী।

তন্ত্র এবং নাথ পন্থী বাউলদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এদের অধ্যাত্ম সাধনা বাঙ্গালী অনার্য অধ্যাত্ম সাধনাকে ভিত্তি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মনে হয় এই সকল বঙ্গদেশজাত অধ্যাত্ম সাধনার একটি বিশিষ্টরূপ বাউল সাধনা।

বাউলেরা যে সকল গান রচনা করেছে তার সঙ্গে বৌদ্ধগান দোঁহার যেন সাক্ষাৎ সম্পর্ক রয়েছে। আমার মনে হয় বৌদ্ধ-গানের মধ্যেই বাউল সাধনার বীজ-মন্ত্র নিহিত রয়েছে। বৌদ্ধ-গান ও দোঁহার সকল অর্থভেদ করতে পারলে তবে বাউল সাধনার রহস্যভেদ সম্ভবপর হবে।

সবচেয়ে অসুবিধার কথা বাউল গান সামগ্রিকভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা থেকে সংগৃহীত হয়নি। এই সংগ্রহের জন্য বিরাট অর্থভাণ্ডারের দরকার। কে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে?

বৌদ্ধগান ও দোঁহা যেমন বাঙ্গালা ভাষাভাষীদের নিকট একটি অপূর্ব "আত্মিকলোক", বাউল গান ও অন্যান্য পর্যায়ের পল্লী গানও তেমনি। বাউলরা এই আত্মিকলোকের অধিবাসী। রবীন্দ্রনাথের কথায় "অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিত্ত লোক। বাউলেরা এই চিত্ত লোকের সাধনায় মত্ত।"

জাতকে আমরা পাই যে শ্মশানঘাট হইতে পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ ক'রে চীবর তৈরীর কথা। বাউলদের সুফীদের এবং শ্রমণদের চীবরের সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। বিলাসিতা ও সংসারমুখীনতাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে মানুষে মানুষে মিলনের সাধনা বাউলদের। সংসারী এবং আবদ্ধ মানুষ নানা খণ্ড এবং কোঠায় বিভক্ত ও আবদ্ধ। সর্ব মানবসত্তা পরস্পর যোগযুক্ত তা বাউলদের জীবনে স্পষ্ট ও সুদৃঢ়। এই জন্য বাউলেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করেন। একে অন্যের শিষ্য হন। ধর্ম এবং জাতিভেদ উপেক্ষা করে।

বাউলদের দেবতার কোন প্রতীক নেই। দেবতাকে তাঁরা মনের মানুষ বলে সাধনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বাউলদের এই ধর্ম-সাধনা সম্পর্কে বলেছেন, "মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ।

জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাইরের বিক্ষিপ্ত আপনহারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলেন পথিক ভিখারীর মুখে :

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ে লোকের মুখেই শুনেছিলেন :

তোর ভিতর অতল সাগর

সেই পাগলই গেয়েছিল :

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা আছে :

আবি রাবীর্ম এধি

পরম মানবের বিরাট রূপে যার স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।"

(পৃঃ ৩৮—৩৯ : মানুষের ধর্ম)

২

রবীন্দ্রনাথের নামই এই বাউল গান সংগ্রহ ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রবাসীতে লালন ফকীরের গান সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গানগুলো দেখেই আমি সর্বপ্রথম বাউল গান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। এবং আমার সে সংগ্রহ সম্ভবতঃ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের প্রবাসীতে ছাপা হয়। তারপর ভারতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক মোহাম্মদী, বিচিত্রা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাউল ও অন্যান্য ধরণের নানা গান প্রকাশ করি।

বাউল ফকীরের মধ্যে আমি প্রধানতঃ লালন ফকীরের গান সংগ্রহ করেছি। বাউল সাধনা সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে প্রধানতঃ লালন ফকীরের গানই আমার প্রধান অবলম্বন।

লালন ফকীর সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের সাহিত্যিকরা পোষণ করেন না।

লালন ফকীর ও হরিনাথ মজুমদার ওরফে ফিকির চাঁদ এবং মীর মোশারফ হোসেন সমসাময়িক এবং একই অঞ্চলের অধিবাসী।

শুনতে পাওয়া যায় লালনের জন্ম হয় হিন্দুকুলে কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। কুষ্টিয়া থেকে মাইল তিনেক দূরে দেঁওড়িয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন প্রায় সোয়া শত বছর পূর্বে এবং ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন। লালনের শিষ্য হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে দেখতে পাওয়া যায়। গোরাই নদীর তীরে কুষ্টিয়ার সন্নিকটস্থ একটি গ্রামে তাঁর সমাধি রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৌলতে এই সমাধি পাকাপোক্ত হয়েছে।

লালনকে প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য লালন সম্পর্কে 'বাঙ্গালীর গান' এবং 'শরৎবাবু ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে' লালন ফকীরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। গৌরচন্দ্র ও লালনচন্দ্রের বাড়ী নদীয়ায়। নদীয়া সুপ্রসিদ্ধ স্থান।

লালন ফকীরের গান আমি আমার হারামণি প্রথম খণ্ডে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশ করি প্রায় পঁচিশ বছর আগে। এর পরে বছর পাঁচেক আগে হারামণি তৃতীয় খণ্ডে লালন ফকীরের আরও শতাধিক গান ছেপে দিই। সম্প্রতি আমার এক ভ্রাতার সাহায্যে ফরিদপুর জেল হাসপাতাল হতে লালনের প্রায় পঞ্চাশটি গান সংগৃহীত হয়। এই গানগুলো ঢাকার "সংবাদ" নামক দৈনিকে প্রকাশ পেয়েছে কিছুকাল আগে। লালন ফকীরের গান যশোহরের শ্রীমতিলাল দাস সংগ্রহ করেছিলেন বলে শ্রীঅন্নদাশঙ্করের মুখ থেকে শুনেছিলাম। ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বসুমতী, মোহাম্মদী, নওরোজ, প্রভৃতি নানা পত্রিকায় লালনের গান প্রকাশ করেছেন নানাজনে নানা সময়ে। এই সকল গান পুস্তকাকারে প্রকাশ করা দরকার।

লালনের নামই সকল শ্রেণীর লোকের নিকট কতকটা পরিচিত। লালনের মতই মদনের নাম। লালন ও মদন উভয়েই মুসলমান। গগন হরকরাও সম্ভবতঃ মুসলমান ছিলেন। মদনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। মদনের আবিষ্কর্তা শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। মদনের গান তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেই গান জগতে প্রচার করেন। মদনের পরিচয় স্পষ্ট করে তিনি দেন নি কোথাও। মদনের একটি গান মাত্র আমার হারামণি প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে।

বাউলদের সন্ধানে শ্রীক্ষিতিমোহন বলেন, "তাহার উপরে আউল বাউল দরবেশদিগের অপূর্ব সংগীত সাহিত্য। আগমনী প্রভৃতি গানেও সব অপূর্ব গান থাকে। বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু মুসলমান কোন ভেদই নাই। লালন, হাসান, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান। মদনের লেখা যেমন গভীর তেমন সুন্দর। তাঁহারই গান :

১ প্রেমের মোল প্রেমই যে বান্দা নারে সুখ নারে সুখ
২ ভবের হাটে আলিরে বান্দা দাম দিবি তুই কিসে
৩ রসের সাগরে ডুব দিতে যে বড়ই ডর লাগে
৪ নিঠুর গরজী তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে
৫ আমার আজব অতিথি
৬ মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ দিবে কিসে ধরা

তাঁহার বিখ্যাত গান ;

যদি করিস মানা ওগো বন্ধু মানি এমন সাধ্য নাই।
কোন ফুলের নামাজ রংবাহারে কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।"

(পৃঃ ৩১—৩২ ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা)

শ্রীক্ষিতিমোহন অন্যান্য সুবিখ্যাত বাউলদের যে নামোল্লেখ করেছেন তা আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করছি।

"বাউল গঙ্গারাম জাতিতে নমঃশূদ্র। বাউল মনাই শেখ শিস্য কালাচাঁদ মিস্ত্রী, তাঁহার শিস্য হারাই নমঃশূদ্র, তাঁর শিস্য দিনু জাতিতে নট, তাঁর শিস্য ঈশান যুগী, তাঁর শিস্য মদন। নিত্যলালের শিষ্য বলা কৈবর্ত, তাঁর শিষ্য বৈশ্য দুইমালী, তাঁর শিষ্য জগা কৈবর্ত তাঁর শিষ্য পাটিয়াল বা কাপালী তাঁর শিষ্য গঙ্গারাম। গঙ্গারাম ও মদন দুই বন্ধু ছিলেন। গঙ্গারামের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিলেন। গঙ্গারামের গানও অপূর্ব।" (ঐ—পৃঃ ৩২)

উপরিউক্ত বাউলদের গানের সংগ্রাহক মাত্র শ্রীক্ষিতিমোহন। রবীন্দ্রনাথের মারফত এই সকল বাউলদের গান জগতে সুপরিচিত। আমি মদন, ঈশানের দুইটী গান সংগ্রহ করতে পেরেছি। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন এই সকল বাউলের কোন পরিচয় দেননি কিংবা কোথা থেকে এই সকল গান সংগ্রহ করেছেন তিনি বলেন নি। সে যা হোক তিনি যদি দয়া করে এই গানগুলো পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন তাহ'লে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ উপকার করা হবে। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় একাজে অগ্রণী হতে পারেন।

পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা জনপ্রিয় বাউলগানের রসে সিক্ত ও উজ্জীবিত ; মরমীয়া জনচিত্তের খোরাক এই বাউল গানগুলো। তাই এই সকল বাউলকবি এবং তাঁদের কর্মসাধনার ক্ষেত্র ভালভাবে আজ আমাদিগকে জানতেই হবে। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার জনসাধারণের দায়িত্ব এ সম্পর্কে সীমাহীন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লোকসঙ্গীত ও গাথা সম্পর্কে যে কাজ করেছেন তা অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। এক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরণের সংগঠনমূলক কার্য আদৌ হয়নি। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিরাট কার্যসূচী পল্লী গান ও গাথার ব্যাপারে উভয় জাতির সম্মুখে রয়েছে। বিশ্বভারতীও মনে হয় বিশেষ কাজ এ সম্পর্কে করবেন বলে আশা করা যায়।

বাউলদের প্রধান কথাই হল জানা। আপনাকে চেন। তার কারণ মনের মানুষ মানুষের মনে বাসা বাঁধা রয়েছে। বাউল কবি গেয়েছেন :

এই মানুষে আছে যে সোনার মানুষ
ডাকলে কথা কয়

এই সোনার মানুষের সাধনাই হল বাউলের। সুতরাং এই সাধনা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সকল অধ্যাত্ম সাধনাই ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাউলদের সাধনার বড় একটা অংশ হচ্ছে দেহের জ্ঞান, দেহ জরীপ। বাউলের গানেই পাই—মণিপুরের খবর জান। কিংবা বাহান্ন গলি তেরপন বাজার। কিংবা আব আতশ খাক বাদ চারচিজে হয় দেহ গঠন। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে বাউল সাধনার এই জায়গায় বড় মিল দেখতে পাওয়া যায়।

চর্যাপদ বা বাউল গানে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। যোগ সাধনার কথা বলা হয়েছে। দেহাভ্যন্তস্থ নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য জ্ঞানই কাম্য।

Rhys Davids বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা চর্যা বা বাউল গানের সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। তিনি বলেন "And it is not by chance, not unadvisedly that the foundation of the higher life, the gate to the heaven that is to be reached on earth is placed not emotion not in feeling but in knowledge in victory over delusions. The moral progress of mankind depends on the progress of knowledge, the moral progress of the individual depends according to Buddhism upon his knowledge. Sin is folly. It is delusion that lends to crime. But to make any advance beyond the average stand point, he must get rid of delusions; he must see things as they are, in a way, ordinary people did not, he must grasp ideas beyond grasp of the adverage mind." (p 208—209)

জানই একমাত্র সেতু :

ভব নই গহীন গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল মাঝে না গাহী
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গাঢ়ই
পারগামি লো অ নির্ভর তরই।

দেহকে বিশ্বের ক্ষুদ্র সংস্করণ বিবেচনা করে চর্যা বাউল ও অন্যান্য ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনাগামী জ্ঞানরাজ্যে যাত্রা করেছেন।

চর্যাপদে ষটচক্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। চর্যাপদে পাই :

এক সে পদুমা চৌষট্টি পাহুড়ী।

এই চৌষট্টি দলভুক্ত পদ্ম হচ্ছে সহস্রার, উর্ধ্বরেতা সাধকদের মজাধাম।

শ্বাস-প্রশ্বাস আপন আয়ত্বে আনতে পারলে সাধকের কালের জ্ঞান তিরোহিত হয়—'ধমন, বমন' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ রয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে গঙ্গা যমুনা নানা শব্দে বুঝান হয়েছে। বাউল সাধকদের গানেও অনুরূপ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মোটকথা বাউলদের কথা বুঝতে গেলে বৌদ্ধ গানগুলোর গুহ্য অর্থ ভেদ করতে হবে। কুম্ভক, রেচক প্রভৃতি শব্দ বাউল গানে নিত্য ব্যবহৃত।

হিন্দু ও বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দে ও সাধন পন্থার সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে, মুসলমান তাসাউফ বা সুফী সাধনার পারিভাষিক শব্দ ও সাধনপন্থা।

একটা আশ্চর্যের বিষয়, হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতের মরমীয়া সাধনায় ষটচক্রের বা ষড় লতিফার স্থান রয়েছে। ষটচক্রের ধারণা কত সুপ্রাচীন তা আমি জানিনে তবে এ ষটচক্র বোধ হয় বাঙ্গলা আর্যপূর্ব অনার্য সাধনার একটি বিশিষ্ট ফল। অবশ্য আজকে আশ্চর্য বোধহয় একথা জেনে যে, It must be remembered that sufi fraternities (e. g. Nagsha bandi) derived or rather favoured from the Indian Vedantats other means to bring about this realisation. They taught initiating the Hindu doctrine of kundalini that these are six great centres of light of various colours in the body of man. (pp. 110—111 The Development of Metaphysics in Persia by Sheikh Md. Iqbal)

তবে হিন্দু ষটচক্র ও সুফী লতিফার বিভিন্ন চক্রের স্থান সম্পর্কে কিছু-কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বটে। আবার সুফী সাধনার তরীকা ভেদে লতিফার স্থান ভেদ কল্পিত হয়েছে।

লালন ফকীর বলেন :

মেরুদণ্ডের পূর্ব ভাগে
যায় চন্দ্র দ্রুতবেগে
সর্পের আকার কুলকুণ্ডলিনী
আছে সেই আসনের পরে।

ষটচক্রের বিবরণীতে পাই "তিনি সর্পের ন্যায় সার্ধত্রিতয় বেষ্টনে পরিবেষ্টনে করে স্বয়ম্ভুর মাথার উপর প্রসুপ্তা রয়েছেন।"

লালনের অন্য একটী গানে পাই :

একটা সাপের দুইটী মুখ
দুইমুখে কামড়ালেন তিনি।

যাহোক, দেহ জরীপ করা হয়েছে এবং সে জ্ঞান বাউলদের প্রবল :

দেহে আট কুঠরী
রিপু ছয় জনা।

আবার পাই :

আঠ কুঠরী নয় দরজা
তার ভিতরে মণিকোঠা
কাজল কোঠার সিঁদ কাটিয়া
চোরে সিঁদে ধন।

আর একটি দরজা রয়েছে তার নাম দশমী দুয়ার অর্থাৎ সহস্রার এবং আবার পাই :

তিনশত ষাইট জোড়াতে এ ঘর বেন্ধেছে
ঘরের কে কোথায় আছে দেখনারে।
আঠার খুটীতে খাড়া, বান্ধেছে ঘর জগৎ জোড়া
ঘরের ছয় দিয়ে ভাগ দশ কোড়ার তার
আজসারে চব্বিশ বন্ধে
ঐ দেখ ঘর রয়েছে।

বিভিন্ন চক্রের সম্পর্কে ও পাওয়া যায় :

দুই দলে বিরাজ করে, সহজ মানুষ হচ্ছে চিনিলেনা
মনের মানুষ হচ্ছে যে জনা।
ও তার দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।

অন্যত্র পাই :

আউয়ালে হয় দুই দল শুনি

ষোলদল দুই দলের পরে, অষ্টদল মন সরোবরে
তারপর সাঁই বিরাজ করে, শতদল পদ্মেতে সুরধুনী।
অধঃ ঊর্ধ্বঃ মেঘের পোড়া, তিনশত ষাইট সেই পদ্ম জোড়া।

হিন্দু অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে যোগ হয়েছে মুসলমান অধ্যাত্ম সাধনার। গঙ্গা-যমুনার মত রাম-রহিমের মরমীয়া সাধনা এক সঙ্গে বয়ে চলেছে এবং সেই সাধনার মিলন-ক্ষেত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেন, "যে সব উদার চিত্তে হিন্দু মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হ'তে পেরেছে, সেই সব চিত্তে সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমার মধ্যে বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতি চরিত্রে এই সব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেচে।" (হারামণির ভূমিকা)।

মুসলমান অধ্যাত্ম সাধনার কথা পাই নীচের একটি গানে :

তুমি লায়লাহা ইল্লাল্লা বল
এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল
অই ভবের হাটে ভুলনারে মুহম্মদ্ রসুল !
সুহ অল এছবতি নফুয়ল নবি,
ও তোমার ফানা ফাল্লা যখন হবি
মেছের শা কয় তবে হবি আল্লার মকবুল।

অন্যত্র পাই :

ও মন মালকুতের মোকামি পানি
লাহুতের মোকামে অগ্নি
জবরুতের মোকামে পানি
হাওয়া চালাচ্ছেন নাছুতের মোকামে।

Prof. R. K. Nicholson প্রণীত Mystics of Islam অথবা W. Clark প্রণীত A wariful Marif প্রভৃতি গ্রন্থে এই সকল পারিভাষিক শব্দের অর্থ ভেদ করা হয়েছে। বাউল সাধনা সুফী সাধনার মতই সার্থক অধ্যাত্ম সাধনা।

রামায়ণে আয়ুর্বেদের শল্যশালাক্য বিদ্যার ছাপ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

রামায়ণ মহাকাব্যের রচনা আগে, নাকি মহাভারত আগেই রচিত হয়েছে, এ তর্ক বহুকালের এবং আজও তা বিতর্কের ব্যাপার। তারচেয়েও বড় তর্ক দুটি মহাকাব্যই বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরে কিনা। এ নিবন্ধের বক্তব্যে তেমন তর্কের অবসর থাকছে না; তবে রামায়ণ মহাকাব্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে পাওয়া যায় মহাকাব্যটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির খরতা ক'মে আসার পরেই রচিত হয়েছে, কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি—

(১) রামায়ণের আদি কাণ্ডের ১৪ সর্গে দেখা যায়—দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে রাজবাড়িতে ভোজন করছিলেন তাঁদের মধ্যে তাপস এবং "শ্রমণ" ছিলেন "তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণা শ্চৈব ভুঞ্জতে"। শ্রমণ শব্দটি জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিজস্ব।

(২) রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ১০৯ সর্গে দেখা যায়—যেখানে রামকে আবার অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান ভরত। তার উত্তরে রাম বেশ কিছু মিষ্টি কথা বলে ভরতকেই ফিরে যেতে বলছেন, সেই সময় জাবালি নামে এক ব্রাহ্মণ এসে রামকে যুক্তি তর্ক শুনিয়ে বোঝাতে চাইলেন যে, জন্মের সঙ্গে একটা কল্পিত সম্বন্ধ স্থাপন করে মা, বাবা ইত্যাদি সংজ্ঞার কোন সত্যকার সম্বন্ধ নাই, নিজের কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে। কারোর মৃত্যুর পর তার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বিধিরও কোন সার্থকতা নাই, পরলোকে বসে ইহলোকের অন্ন পিণ্ড ভক্ষণ করার সামর্থ্য যদি থাকে, তার বিদেশ যাত্রার সময় সঙ্গে পাথেয় দেবার কি দরকার? এখানে বসে দেওয়া হবে, আর তিনি প্রবাসে থেকেই খাবেন, শ্রাদ্ধে কাউকে ভোজন করালে যদি মৃত ব্যক্তি খেতে পারে তবে সেটা কৌতুককর নয় কি? এসব গ্রন্থ বুদ্ধিমানের লেখা

"অষ্টকা পিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ।
যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহ মন্যস্য গচ্ছতি।
দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং নতৎ পথ্যশনং ভবেৎ।
দানসংবননা হ্যেত গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ"

হে নাথ! রাম! পিতৃসত্য পালন, পিতৃআজ্ঞা পালন এসব বাজে কথা, এখানেই থাক, নিজেও সুখে থাক, আর সকলে যাতে সুখে থাকে তাই কর, এইটাই তোমার কর্তব্য।

জাবালির এই সব যুক্তি তর্কের কথা শুনে রাম বিষম চটে গেলেন, বললেন দেখুন জাবালি, আপনি পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু আপনি পুরো নাস্তিক। নাস্তিকের সঙ্গে বাক্যালাপও করা উচিৎ নয়। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে চোর এবং নাস্তিক বৌদ্ধদের যেমন রাজকীয় শাস্তি দেবার বিধান আছে, আপনাকেও তেমনি শাস্তি দেওয়া উচিৎ—

যথা হি চোরঃ স তথাহি বৌদ্ধঃ
তথা গতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি।

তস্মাৎ হি শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে নাভি মুখো বুধঃ স্যাৎ ॥

এসব উক্তি প্রত্যুক্তি পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধেই যায়, তেমনটি কি পুরোহিত-তন্ত্রের অনুকূলে লেখা রামায়ণে স্থান পেতে পারে? একেবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বুদ্ধ বৌদ্ধ নাম উল্লেখ করে।

(৩) রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে ১১৪ সর্গে যেখানে ভরতের সঙ্গে তাঁর মামা যুধাজিতের মিলন এবং স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে সংগ্রাম এবং তার পরেই নিজের দুই রাজকুমারের জন্য গন্ধর্ব দেশটাকে ভাগ করে দিলেন, সেখানে প্রথম কুমার তক্ষকে "তক্ষশিলা" এবং দ্বিতীয় পুষ্কলকে "পুষ্কলাবত" দুই রাজ্য ভাগ করে দিলেন। সেখানেও বোঝা যায় এই তক্ষশিলা নামটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রচারের পরই ভারত ইতিহাসে বিশেষ স্থান পেয়েছে। এখানেই পাণিনি প্রভৃতির জন্ম।

এই সব নজির দেখিয়ে মনে করা যায় বৌদ্ধযুগের বোলবোলাও অনেকটা শিথিল হওয়ার পরই রামায়ণের রচনা।

তা থাক, তেমন সমাজে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা-বিদ্যার (মেডিক্যাল এবং সার্জারি) প্রসার খুবই ছিল। অর্থাৎ রামায়ণ রচনার যুগে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-বিদ্যাটির যে চর্চা খুবই হোতো, তার নিদর্শন দেওয়া যাক—

(১) রামায়ণের আদি কাণ্ডের ৪৯ অধ্যায়ে আছে, এক সময় ইন্দ্র গৌতমের অভিশাপে অণ্ডকোষ দুটি হারিয়েছিলেন, কিন্তু দেব-চিকিৎসকদের চিকিৎসায় একটি মেষের দুটি অণ্ডকোষ জুড়ে দিয়ে তৎকালেই শল্য শালক্য চিকিৎসার (সার্জারি) চমৎকার কৃতিত্ব উল্লেখ্য হয়েছিল। ঘটনাটি এই ভাবে—রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে, বনে বনে দুর্দান্ত বন্য মানুষদের অত্যাচার থেকে সাধু-তপস্বীদের রক্ষা করতে, সেইসময়ে পথে পড়েছিল গৌতম মুনির আশ্রম। সেই আশ্রমেই থাকতেন অহল্যা। কিন্তু তিনি তখন স্বামী ও সমাজের অভিশপ্তা, যেহেতু এক সময় অহল্যা সমাজমান্য ইন্দ্র নামক কোন দেবপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারগ্রস্তা হন, সেই ঘটনাটা গৌতমের অনুপস্থিতিতেই হয়েছিল, কিন্তু ইন্দ্র এসেছিলেন গৌতমের আকৃতির মেকাপ নিয়ে। তবুও ইন্দ্র অহল্যার সান্নিধ্য ছেড়ে এক রকম পলায়নই করছিলেন, কিন্তু এমনি দৈববিড়ম্বনা যে, একেবারে গৌতমেরই সামনে পড়লেন ইন্দ্র। গৌতমের ক্রোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাই পরেই অভিশাপ দিলেন ইন্দ্রকে, তুমি কোষহীন হইয়া যাও—

অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ।
দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্বচনমব্রবীৎ
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে!
অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলঙ্ক ভবিষ্যসি।

অভিশাপেই অণ্ডকোষটি খসে পড়লো কি ছুরি দিয়ে কেটে দিলেন, সে নিয়ে বাল্মীকি কদর্থিত রসিকতা করেন নাই। কিন্তু ইন্দ্রের জীবনে এক সাংঘাতিক বৈকল্য। পৌরুষ দৃপ্ততা যে দুটির ভরসায় তা গেল।

গৌতমেন এব মুক্তস্তু সরোষেণ মহাত্মনা।

পেতুস্তু বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ ॥

কিন্তু ইন্দ্র জানতেন, এ এমন কি অভিশাপ! এখনই অশ্বিনীকুমারদের শল্য শালক্য বিদ্যার অব্যর্থ চেষ্টায় কোষ দুটি ফিরে পাব। তাই হোলো, ইন্দ্রের জরুরী ডাকে তাঁরা এলেন এবং দ্রুত ব্যবস্থা করলেন, সামনেই চরছিল মেষের পাল, তৎক্ষণাৎ একটি মেষের দুটি অণ্ডকোষ ছেদন ক'রে ইন্দ্রের ছিন্ন ফলকোষের জায়গায় জুড়ে দিলেন। ইন্দ্র তাতে নতুন নাম পেলেন "মেষবৃষণ"।

দ্রুতং তৎ বচনং শ্রুত্বা দেববৈদ্যৌ সমাগতৌ।
উৎপাট্য মেষ বৃষণৌ সহস্রাক্ষে নবেশয়ন্॥

রামায়ণের সমাজে আয়ুর্বেদের সার্জারি চিকিৎসার এই উল্লেখ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। (২) রামায়ণের লেখক যিনিই হোন্, তাঁর সময়ে যে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে ধন্বন্তরি নামের চিকিৎসক এবং তাঁর সম্প্রদায়ের খ্যাতি খুবই হ'য়েছিল তার নিদর্শন রামায়ণের আদি কাণ্ডে রয়েছে এবং তখন যে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের রস বা পারদেরও উদ্ভব হয়েছিল এও নিঃসন্দেহ। সেই পারদেরই এক নাম "রস" এ তথ্য পাওয়া যায় রামায়ণের আদি কাণ্ডের ৪৫ সর্গে। সেখানের প্রসঙ্গটি এই রকম,—বিশ্বামিত্রের সংগামী রাম-লক্ষ্মণ গঙ্গায় নৌকায় চড়ে যেতে যেতে গঙ্গার উত্তর 'বিশালা' নগরী দেখতে পেলেন। ঐ নগরী কেমন করে স্থাপিত হোলো, জানতেই, বিশ্বামিত্রের উক্তিতে নগরী স্থাপনের পূর্বে সমুদ্রমন্থনের কাহিনী শুনলেন যে, একসময় বিষ্ণুর মধ্যস্থতায় সমুদ্র মন্থনের পর ধন্বন্তরি নামে জনৈক পুরুষ, যিনি আয়ুর্বেদজ্ঞ তিনি উত্থিত হন। তাঁর হাতে ছিল রস এবং সঙ্গে উচ্চস্তরের অপ্সরা ছিলেন।

দেবানাং মধ্যতঃস্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ।
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ স কমণ্ডলুঃ।
অথ বর্ষ সহস্রেণ আয়ুর্বেদময় পুমান্।
অথ ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ।
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাতস্মাদ্ বরস্ত্রিয়ঃ॥

সেই ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের আয়ুর্বেদীয় বিদ্যাটির একটি প্রধান অঙ্গ ছিল "শল্য-শালাক্য চিকিৎসা" যা আজকের সার্জারি বিদ্যা। চরকীয় সম্প্রদায় বা আয়ুর্বেদের ভারদ্বাজীয় সম্প্রদায়ের আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার নাম "কায়চিকিৎসা' বা মেডিক্যাল সায়েন্স। ভারদ্বাজীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ "চরক সংহিতা"। এই সংহিতায় সুশ্রুত সংহিতার ধন্বন্তরির নাম কয়েক বারই উল্লেখিত হয়েছে।

রামায়ণে ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের সার্জারি চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরও কয়েকবার নিদর্শন রাখা রয়েছে—

(৩) মূঢ় গর্ভে শল্যকর্ম অর্থাৎ সুশ্রুত সংহিতার চিকিৎসা স্থানের ১৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যদ্ যদঙ্গং হি গর্ভস্থ তস্য সজ্জতি তদ্ ভিষক্
সম্যগ বিনির্হরেৎ ছিত্বা রক্ষেৎনারীং চ যত্নতঃ॥"

অর্থাৎ গর্ভবতী রমণীর প্রসবের জন্য গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ছেদন করার প্রয়োজন হয়, তা হলে তাও করবে চিকিৎসক, যত্ন করে নারীকে রক্ষা করাই আগে প্রয়োজন।

ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের এই কর্তব্যটির মধ্যে গর্ভস্থ শিশুর চেয়ে তার মাতাকে রক্ষা করার মধ্যে নিষ্ঠুরতা ও করুণার একত্র সমাবেশ। রামায়ণ লেখক এই দৃষ্টান্তটি সীতার বন্দীজীবনে একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন। প্রসঙ্গটি আছে রামায়ণের সুন্দর কাণ্ডের ২৮ সর্গে। সে সময় সীতা রাবণের বাগান-বাড়িতে বন্দিনী হয়ে আছেন, আর রাবণের প্রেরিত দাসীরা এসে বার বার তর্জন ভৎ'সনা করছে, সেই সময় যখন শুনলেন, এতদপেক্ষা আরও কঠোর শাস্তি রাবণ দেবে তখন সীতা খুবই ভীত হয়েও রামের আসাকে আরও ত্বরান্বিত করতেই অনুচ্চ স্বরে বলছেন। হায় হায়! এরই ভিতর রাম যদি না আসেন তা হলে ওই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রাবণ আমার যে দুর্দশা করবে, তা কিন্তু সেই অস্ত্র চিকিৎসকের মূঢ় গর্ভনিষ্কাসনের জন্য শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদনের চেয়ে কিছু কম নয়। আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই ছেদন করবে সেই রাবণ—

তস্মৈন্মনা গচ্ছতি লোকনাথে
গর্ভস্থ জন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।
নূনং মমাঙ্গান্য চিরাদনার্য্যঃ
শরৈঃ শিতৈ শ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্র ॥

বন্দিনী সীতার ব্যাকুলতা বোঝাতে কবির বাস্তব উপমার মধ্যে আয়ুর্বেদের শল্যশালাক্য চিকিৎসার (সার্জারি) ক্ষেত্রটির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের পরিচয় খুব গাঢ় ছিল বলেই মনে করা যায়।

আয়ুর্বেদের শল্যশালক্য বিদ্যার বিশেষ স্থান চারটি, শরীর থেকে শল্য (স্প্লিন্টার) বের করা, এর জন্য এ্যামপুটেশন করাও একটি (ছেদন, ভেদন প্রভৃতি)। দ্বিতীয় স্থল সবর্ণীকরণ, অর্থাৎ চামড়া নিয়ে অন্যত্র বসান, কিংবা অন্য ভাবে গায়ের রং মিলিয়ে দেওয়া (প্লাষ্টিক সার্জারি)। তৃতীয় স্থল সন্ধান করণ, অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানটি আহত বা ক্ষত বা দূষিত হয়েছে তা দেখা (এক্স্‌রে করা)। এ পদ্ধতিটি যন্ত্র দ্বারাও হয়, আবার হস্তস্পর্শ দ্বারাও হয়। চতুর্থস্থল মৃতসঞ্জীবন করা, মুমূর্ষুকে বাঁচানর উপায় করা (আধুনিক পথ বন্ধ, গ্যাস দেওয়া, স্যালাইন দেওয়া, কোরামিন্ দেওয়া প্রভৃতি)। রামায়ণের লেখক তা ভাল করেই জানতেন, তাই রাম-রাবণের যুদ্ধে যুদ্ধে যখন হনুমানকে বল্লেন চিকিৎসক জাম্ববান্, যাও হনুমান্, দ্রুত যাও, অর্ধমৃত সেনানীদের এবং রঘুপতির প্রাণ রক্ষার জন্য হিমালয় শিখর থেকে এই চার প্রকার ভৈষজ্যের সমাহার কর—

কৈলাশ শিখরংচাত্র দ্রক্ষ্য রি নিস্বদন্।
ক্ষক বানবীরাণাং অনীকানি প্রহর্ষয়।
বিশল্যৌ কুরু চপ্যেতৌ সাদিতৌ রামলক্ষণৌ
মৃত সঞ্জীবনীঞ্চৈব বিশল্য করণী মপি
সুবর্ণ করণীংচৈব সন্ধানীং চ মহৌষধীম্ ॥

কাব্যে যে ভাবে ঔষধগুলির বর্ণনা তার সাধারণ ব্যাখ্যায় দাঁড়িয়েছে, যে, ওই চার প্রকার ভেষজের ব্যবস্থার অর্থ চার প্রকার গুল্ম লতার ব্যবহার। তাই আমাদের দেশে থারা পান, এবং ঐগুলিই নাকি বিশল্য করণী বলে ধারণা করানর চেষ্টা এক অদ্ভুত লোকব্যবহার। আসলে যে কোন

সংগ্রামের সময় ঐ চার প্রকার শল্য শালাক্য চিকিৎসার ব্যবস্থাই রাখতে হবে। কিন্তু কোন্ ব'নেদী মূর্খ যে এমন ব্যাখ্যা করেছেন আজও তা অজ্ঞাত। আসলে চিকিৎসা শব্দটি বিশেষ্য আর তার বিশেষণ হলো—(১) বিশল্যকরণী চিকিৎসা। (২) সন্ধান করনী চিকিৎসা। (৩) সবর্ণকরনী চিকিৎসা এবং (৪) মৃতসঞ্জীবনী চিকিৎসা।

যে মহাকবি ভারতের আদি কবি বলে স্মরণাতীতকাল থেকে এদেশে পূজনীয় এবং যিনি ভারতের আয়ুর্বেদীয় বিদ্যার শল্য শালাক্যধারাটি ভাল করেও অধিগত করে সীতার অসহ্য ব্যথার বর্ণনা করেছেন। তিনি যে ঐ চার প্রকার চিকিৎসার (শাল্যশালকা চিকিৎসার) রীতিটিকে ছুচারটে লতাপাতার রস সংগ্রহ করতে বলবেন এটা হাস্যকর নয় কি ?

যে বাল্মীকি সেতুবন্ধনের জন্য যন্ত্রের দ্বারা শিলা-পাথর আনিয়ে একেবারে মাপজোক করার পর স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখেছেন, তিনি বিশল্যকরণী প্রভৃতি শব্দগুলিকে গুল্মলতার ধাঁধায় ফেলতে পারেন কি ?

এই বাল্মিকীকিই আবার আশুমৃতকের কি লক্ষণ তারও বর্ণনা দিয়েছেন সুশ্রুতের মরিথ-লক্ষণের বর্ণনা অনুযায়ী। যখন অর্ধমৃত বানর সেনানী ভূমিলগ্ন হয়ে কাতরধ্বনি করছেন, সেই সময় জাম্ববান, হনুমান গিয়ে সংগ্রাম স্থলীতে উপস্থিত হলেন, বিশেষ ধরণের আলোর সাহায্যে তাদের মুখের, চোখের, ঠোঁটের আকৃতি দেখে বল্লেন—না কেউ মরেন নাই, সকলেই সম্মোহন অস্ত্রের আঘাতে মৃতপ্রায় মূর্ছিত। অর্থাৎ কেমিকেল অস্ত্রের প্রয়োগের ফলেই এদের এই দশা।

এই সবের উল্লেখ দেখে বলতেই হয় আয়ুর্বেদের পূর্ণাঙ্গ রূপটি যখন বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের আগে নয়, তখন এই রামায়ণের গ্রন্থকারও বাল্মীকি নামের আড়ালে থেকে তৎকালের সমাজ-চিত্রটিরও পূর্ণ রূপ দান করেছেন। হয়তো বা বৈদিক সংস্কৃতির ছাপ তখনও ভাল করে সামাজিক মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি বলে যাগ-যজ্ঞেরও একটা ভাঙ্গা কাঠামো এতে পড়ে আছে।

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মায়াময় এই সংসারে সর্বত্রই মায়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মায়ার প্রসাদেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, মরীচিকায় স্রোতস্বতীভ্রম হয়। শব্দরাশিও এই মায়াপাশ অতিক্রম করিতে পারে না। এই কারণে অনেক স্থলে পরস্পর অসম্বদ্ধ শব্দগুলিও সুসম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষা হইতে এইরূপ কয়েকটি শব্দের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বৃথা ও ব্যর্থ

বৃথা ও ব্যর্থ এই দুইটি শব্দের শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য পরিস্ফুট, অথচ ইহারা সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র শব্দ। বিগত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার এইভাবে বি এই উপসর্গের সহিত অর্থশব্দের বহুব্রীহি করিলে 'ব্যর্থ' হয়, আর বৃ ধাতুর উত্তর থা প্রত্যয় করিয়া 'বৃথা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃ ধাতুর অর্থ বরণ করা, বাছিয়া লওয়া, ইচ্ছা করা। থা প্রত্যয়ের অর্থ প্রকার। থা প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদগুলি ক্রিয়ার বিশেষণ (adverbs of manner)। সুতরাং বৃথা শব্দের অর্থ—স্বেচ্ছায়, অনায়াসে, সহজে বেদের বিধি অনুসারে নহে, কিন্তু অবাধে, নিজের ইচ্ছানুসারে (at one's sweet will) আর যাহা শাস্ত্রের বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সার্থক, যাহা স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের দিক্ দিয়া তাহা নিরর্থক, ফলে ক্রমশঃ বৃথাশব্দের অর্থ হইল—নিরর্থক, অবিধিপূর্বক। তাই আমরা অমরকোষে পাই—বৃথা নিরর্থকাবিধ্যোঃ। বিশ্বপ্রকাশকার আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—বৃথা নিষ্কারণে বক্ত্যে বৃথা স্যাদ্বিধিবর্জিতে। ঋগ্বেদে (১।৯২।২) উষার বর্ণনায় আছে—

উদপপ্তন্নরুণা ভানবো বৃথা
স্বায়ুজো অরুষীর্গা অযুক্ষত।
অক্রন্নুষাসো বয়ুনানি পূর্বথা
রুশন্তং ভানুমরুষীরশিশ্রয়ুঃ।

অরুণবর্ণ রশ্মিগুলি সানন্দে (বৃথা) উৎপতিত হইয়াছে, অতি সহজে যে গোরুগুলিকে রথে যোজিত করা যায় সেই অরুণবর্ণ গোরুগুলিকে রথে যোজিত করিয়াছেন, উষারা পূর্বের মত আলোকের জাল রচনা করিয়াছেন, অরুণবর্ণ উষার উজ্জ্বল আলোক সুদূরে বিস্তারিত করিয়াছেন।

বৃথা পশুহনন শব্দের অর্থ—নিজের সুখের জন্য পশুহনন, যজ্ঞাদির জন্য নহে। বৃথা মাংসভক্ষণ শব্দের অর্থ—নিজের ইচ্ছায় মাংসভক্ষণ, শাস্ত্রের নির্দেশ নহে। মনুসংহিতায় বৃথাটা বা বৃথাভ্রমণ ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

ঐতরেয় আরণ্যকে (২।৩।৬) আছে—ঋগ্ গাথা কুম্ব্যা তন্মিতং যজুর্নিগদো বৃথা বাক্ কর্ম কুরু, মা সুযুপ্থাঃ ইত্যাদি) এইগুলি মিত। আর যজুর্মন্ত্র, নিগদ ও স্বেচ্ছায় উচ্চারিত শব্দ অমিত। এ স্থলে বৃথা শব্দের মধ্যে যেন একটু নিরর্থকতার আভাস আছে বলিয়া মনে হয়।

কালিদাসের সময় যে বৃথাশব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কুমারসম্ভবে আছে—

দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা
ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৫।৪৫

"স্বর্গই যদি কামনা তোমার কাজ কি এ তপে তবে
অমরাবতী ত তোমারি পিতার রাজ্যে জানে তা সবে।
তবে কি কামনা প্রিয়পতিলাভ বৃথা এ সাধনা হায়।
রত্ন আপনি খোঁজে না জহুরী, জহুরীই খোঁজে তায় ॥"

উত্তররামচরিতে এই অর্থে বৃথা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—ব্যর্থং যত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্যং হরীণাং বৃথা (৩।৪৭)। যেখানে কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত আমার বন্ধুত্ব ব্যর্থ, যেখানে বানরগণের বীরত্ব ব্যর্থ।

চাণক্য শ্লোকে আছে—

বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রেষু বৃথা তৃপ্তস্য ভোজনম্
বৃথা দানং সামর্থস্য বৃথা দীপো দিবাপি চ ॥

একটি উদ্ভট শ্লোকে আছে—

বৃথা কথং নৃত্যসি চাতক ত্বং
ন নীলমেঘোঽয়ং গজো মদান্ধ।
স তাদৃশেভ্যো ন দদাতি নূনং
মতঙ্গদানং মধুপেভ্য এব ॥

হে চাতক, তুমি (কেন আনন্দে বিহ্বল হইয়া) মিছামিছি নৃত্য করিতেছ? এ ত নীলমেঘ নহে, এ মদমত্ত হস্তী। সে কখন তোমার মত প্রার্থীদের কিছু দান করে না। মধুপগণের (ভ্রমর গণের) জন্যই মাতঙ্গের দান (মদবারি)

বৃথাশব্দের এই অর্থের পরিবর্তনে সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন প্রতিবিম্বিত। প্রথম লোকের ধারণা ছিল, যাহাতে আত্মার আনন্দ, যাহাতে আত্মতুষ্টি তাহাই সৎ। পরে সভ্য-সমাজে স্বেচ্ছাচারের অপ্রতিহত প্রসার দেখিয়া লোকের মনে হইল—যাহা নিজের ইচ্ছায় করা যায়, যাহার পশ্চাতে শাস্ত্রের নির্দেশ না থাকে, তাহাই নিরর্থক, তাহাই অসৎ।

শ্রদ্ধা ও অদ্ধা

আপাতদৃষ্টিতে অদ্ধা শব্দটি শ্রদ্ধা শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন, 'পবন' ও 'বনে'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন 'মানব' ও 'নব'র মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রদ্ শব্দের উত্তর ধা ধাতুর পরে অঙ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রদ্ধা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ শব্দের অর্থ হৃদয়, গ্রীক্ Kardia, লাটিন Cor. Cordis, লিথুয়েনীয় শিদিস্, জার্মান্ Herz, ইংরাজী

heart ইহারা এই শ্রদ্ শব্দের জ্ঞাতি। ধা ধাতুর অর্থ স্থাপন করা, দান করা, সুতরাং শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হৃদয়বান, বিশ্বাসস্থাপন।

অদ্ শব্দের উত্তর প্রকাশ অর্থে ধা প্রত্যয় করিয়া অদ্ধা হইয়াছে ইহার অর্থ এইভাবে, অর্থাৎ সত্য সত্য ঠিক ভাবে, যথার্থভাবে। এই শব্দটি আবেস্তায় azda আকারে দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ নিশ্চয়, জ্ঞান।

যাহা সত্য হয় লোকে তাহা বিশ্বাস করে, আবার যাহা বিশ্বাস করে, তাহাই সত্য, বলিয়া মনে করে, ফলে শ্রদ্ধা ও অদ্ধা এই দুইটি শব্দের মধ্যে অর্থগত একটু সাদৃশ্য আছে, শব্দগত সাদৃশ্য ত সুপরিস্ফুট। কোন কোন স্থলে দেখা যায় শব্দের আদিস্থিত স লুপ্ত হইয়া যায়। যেমন ইংরাজীতে আমরা পাই star কিন্তু সংস্কৃত স্তৃ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তারাকেও দেখিতে পাই। প্রাচীন স্তরশব্দ অশ্বতর, বৎসতর প্রভৃতি শব্দে তর-আকারে দৃষ্ট হয়। অনেকের মনে হয় এই ভাবেই শ্রদ্ধার আদিস্থিত শ্ ও র্ লুপ্ত হইয়া অদ্ধা হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মনে করেন অদ্ধা শব্দটি শ্রদ্ধারই অপভ্রংশ। এই রূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া মনীষিবর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্মতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি শ্রবণ কর—

"সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্য।"

'অর্থাৎ সর্ব্বকর্মা সর্ব্বকাম সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যহীন আপ্তকাল হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে ইনিই ব্রহ্ম এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে ইহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি, যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না: ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।

'এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে।'

শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতে শেষ অংশের অনুবাদ এইরূপ হইবে: এই লোক হইতে গমন করিয়া ইহাকেই অনুভব করিব, যাঁহার সত্যই এইরূপ জ্ঞান হয়, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না, তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে পাইয়া থাকেন।

অদ্ধা শব্দের অর্থ যে সত্য সত্য তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে।

ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্ত (১০।১২৯।৬) আছে—

যো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনা-
থা কো বেদ যত আবভূব ॥

কে ঠিক ভাবে জানে, কে এখানে বলিবে, কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে, কোথা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি আসিল? দেবগণ এই বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ববর্তীকালের পরবর্তী (কেন না তাঁহারাও

সৃষ্টির অংশ।) তাহা হইলে কে জানে কোথা হইতে ইহা আসিল। কালিদাসের রঘুবংশে (১৩।৬৫) আছে—

অদ্ধা প্রিয়ং পালিতসঙ্গরায়
প্রত্যর্পয়িষ্যত্যনঘাং স সাধুঃ।
হত্বা নিবৃত্তায় মৃধে খরাদীন্
সংরক্ষিতাং ত্বামিব লক্ষ্মণো মে।

যুদ্ধে খর প্রভৃতি রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ যেমন (রাক্ষসাক্রমণ হইতে সুরক্ষিত তোমাকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সাধুও প্রতিজ্ঞাপালনপূর্বক প্রত্যাগত আমাকে, অনুপাভুক্তা রাজলক্ষ্মীকে সত্যসত্যই প্রত্যার্পণ করিবেন।

পণ্ডিত রাজ জগন্নাথের ভামিনীবিলাসে আছে—

হালাহলং খলু পিপাসতি কৌতুকেন
কালানলং পরিচুচুম্বিষতি প্রকামম্।
ব্যালাধিপং চ যততে পরিরব্ধুমদ্ধা
যো দুর্জনং বশয়িতুং তনুতে মনীষাম্।

যিনি দুর্জনকে বশ করিতে মানস করেন তিনি সানন্দে কালকূট বিষ পান করিতে ইচ্ছা করেন, প্রাণ ভরিয়া প্রলয়কালীন অগ্নিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, সত্য সত্যই সর্পরাজকে আলিঙ্গন করিতে প্রযত্ন করেন। রসগঙ্গাধরে আছে—

প্রণিপত্য বিধে ভবন্তমদ্ধা
বিনিবদ্ধাঞ্জলিরেকমেব যাচে।
জন্মন্তুকুলেষু বিধানা-
মপি গোবিন্দপদারবিন্দভাজাম্ ॥

সুতরাং দেখা গেল শ্রদ্ধা ও অদ্ধার সম্বন্ধ প্রতিভাসিক পারমার্থিক নহে।

বাব ও বাবা

তৈত্তিরীয়সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে অবধারণার্থক বা বাক্যালঙ্কারে প্রযুক্ত বাব এই নিপাত মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্কৃত 'বা' এই নিপাতের দ্বিত্ব করিয়া বাব হইয়াছে মনে হয়। ইহার সহিত বাংলার বাবা শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয়ের গীতা ব্যাখ্যা ভূমিকায় এক টাকা চৌদ্দ আনা পৃষ্ঠে দেখা যায়—কোথাও বাব অর্থাৎ বাবা বা বৎস বলিয়া শ্রোতাকে সম্বোধন করিয়া সে উপদেশ দিয়াছেন, অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি।

ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টমাধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে আছে—মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাম্। ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপ হতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ ইতি।

হে ইন্দ্র, এই শরীরটি মরণধর্মী, সর্বদা মৃত্যুদ্বারা গৃহীত। সেই আমরণধর্মী ও অশরীরী আত্মার ইহাই অধিষ্ঠান। শরীরবিশিষ্ট আত্মাই প্রিয় ও অপ্রিয় কর্তৃক আক্রান্ত (সুখ ও দুঃখের অধিকারভুক্ত)

কেন না যতক্ষণ শরীর থাকে, ততক্ষণ প্রিয় বা অপ্রিয়ের বিনাশ হয় না (সুখ দুঃখের পাশ হইতে মুক্তি নাই)। শরীরশূন্য হইলেই প্রিয় ও অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (তাহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না।)

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে বাক্যের মধ্যস্থিত অপাদাদিস্থিত সম্বোধন পদ অনুদাত্ত হয়। বাবশব্দের অনুদাত্ত হওয়া দূরের কথা একটা স্বরের স্থলে ইহার দুইটি স্বরই উদাত্ত। সুতরাং ইহার অর্থ কিছুতেই বাবা বা বৎস হইতে পারে না।

পর ও অপর

সংস্কৃত ব্যাকরণে সর্বনামসংজ্ঞক শব্দের তালিকায় পর ও অপর এই দুইটি শব্দই পঠিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় পর্যাপ্ত অপর্যাপ্ত, কুমারী অকুমারী প্রভৃতি শব্দনিচয়ের ন্যায় পর অপর এই দুইটি শব্দও একার্থবোধক। মনে হয় এস্থানে অ-টি নিষেধার্থক নহে, অবধারণার্থক (intesive)। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাহা নহে। পর শব্দের প্রাথমিক অর্থ দূর, ইংরাজী far ও fore শব্দের ইহা জ্ঞাতি। দূর হইতে অর্থ হইল দূরবর্তী, পরবর্ত্তী, ভবিষ্যৎ, তাহা হইলে অর্থ হইল অন্য।

এক—নিকটবর্তী, পর—দূরবর্তী অর্থাৎ অন্য, তাহা হইলে অর্থ হইল অপরিচিত, তাহা হইতে অর্থ হইল শত্রু। অন্যদিকে আবার দূর, দূরতর হইতে অর্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী শব্দ—অবর। পৃ ধাতুর অর্থ পার হওয়া (ইংরাজী (ferry) তাহা হইতে 'পর' শব্দ আসিয়াছে।

ঋগ্বেদে (২।১২।৮) আছে—

যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে
পরেইবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা
নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ।

যাঁহাকে উচ্চ শব্দকারী সেনাদ্বয় দূরবর্তী ও নিকটবর্তী উভয় শত্রুই একত্র হইয়া বিবিধ ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে, দুই জনে একই রথে আরোহণ করিয়া যাঁহাকে পৃথগ্‌ভাবে আহ্বান করিয়া থাকে হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র।

অপ-শব্দের উত্তর রপ্রত্যয় করিয়া অপর হইয়াছে। ইহা পূর্বশব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার অর্থ—পশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী কালের, তাহা হইতে অর্থ হইল—পরবর্তী অন্য। ঋগ্বেদে আছে (১।১২৪।৯)—

আশাং পূর্বাসামাহস্ব স্বস্বণা-
মপরা পূর্বামভ্যেতি পশ্চাৎ।
তাঃ প্রত্নবন্নব্যসীর্নূনমস্মে
রেবদুচ্ছন্তু সুদিনা উষাসঃ॥

এই প্রাচীন ভগিনীগণের মধ্যে পূর্ববর্তিনী প্রতিদিন পরবর্তিনীর পশ্চাতে আগমন করেন। এই নূতন উষারা পূর্বকালের ন্যায় এক্ষণেও আমাদিগের উপর ধন ও সুদিন বর্ষণ করুন।

উপম ও উপমা

এই শব্দ দুইটি প্রথম দর্শনে সম্বন্ধ বলিয়া মনে হয়, কারণ উপমা শব্দ বহুব্রীহি সমাসের শেষ

থাকিলে উপমা আকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটির মধ্যে কোন জ্ঞাতিত্ব নাই। উপশব্দের উত্তর ম (তম) প্রত্যয় করিয়া উপমশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার অর্থ—উচ্চতম। উপ-পূর্বক মা ধাতুর উত্তর অঙ্ প্রত্যয় করিয়া উপমা হইয়াছে। ইহার অর্থ সাদৃশ্য।

লক্ষ্মী ও Lucky

সংস্কৃত লক্ষ্মী শব্দের সহিত ইংরাজীLuck বা Lucky শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে Lucky শব্দটি লক্ষ্মীর অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

বর্তমানকালে লক্ষ্মীর বরপুত্র হইতে কাহার না বাসনা হয়? ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভের কথাও প্রায়ই শোনা যায়। লক্ষ্মী বলিলে আমরা সম্পদ্ ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বুঝিয়া থাকি। লক্ষ্মী-শব্দের প্রাথমিক অর্থ কিন্তু চিহ্ন, লক্ষণ, নিমিত্ত। 'পাপা লক্ষ্মী' বলিতে অশুভ নিমিত্ত (evil women) ও 'পুণ্যা লক্ষ্মী' বলিতে শুভ নিমিত্ত বোঝাইত। ক্রমশঃ লক্ষ্মী শব্দের অর্থ হইল—সৌভাগ্য, সম্পদ, সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বেদে যিনি উষা ছিলেন, পুরাণে তিনি লক্ষ্মী হইলেন। ইংরাজীতে luck শব্দের প্রথমতঃ অর্থ ছিল দৈব, ভাগ্য, যেমন good luck, bad luck, try one's luck, as luck would have it ক্রমশঃ অধিকাংশ স্থানেই শব্দটি সৌভাগ্য অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল, যেমন to have no luck, same people have all the luek, to be in luck, to be off one's luck, for luck ইত্যাদি। Luck শব্দটি জার্মান্ Glueck আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবত প্রাচীন জর্মান lackon (আকর্ষণ করা, ভুলাইয়া আনা) হইতে Luck আসিয়াছে। লক্ষ ধাতু হইতে লক্ষ্মী আসিয়াছে। লক্ষ শব্দও এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। লক্ষ শব্দের অর্থ যাহা কিছুতে আটকাইয়া থাকে অথবা আটকাইয়া দেওয়া হয়, চিহ্ন। তাহার পর অর্থ হইল যাহা লক্ষ করিয়া লোকে প্রবৃত্ত হয়। সেকালে সম্ভবতঃ লক্ষ টাকা পণ হইত। ক্রমশঃ লক্ষ শব্দের অর্থ হইল শত সহস্র।

Character ও চরিত্র

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি সংস্কৃত চরিত্র ও ইংরাজী character একই মূল শব্দের বিভিন্ন রূপ, কেন না শব্দ দুইটির মধ্যে অর্থগত বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চর্ ধাতুর অর্থ—বিচরণ করা, চলা। এই চর ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ইত্র প্রত্যয় করিয়া চরিত্র হইয়াছে। অর্থ যাহার দ্বারা বিচরণ করা যায়, অর্থাৎ পা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ—চরণ। ঠিক এই ভাবে গত্যর্থক ঋ ধাতুর উত্তর ইত্রপ্রত্যয় করিয়া অরিত্র হইয়াছে, অর্থ যাহার দ্বারা নৌকা গমন করে অর্থাৎ দাঁড়। গ্রীক ভাষায় ইহার আরোত্রোন্ ও লাটিন ভাষায় আরাত্রুম্ আকারে দৃষ্ট হয়। অর্থ—লাঙ্গল। বহনার্থক বহ্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া বহিত্র হয়, অর্থ—যাহা বহন করে অর্থাৎ গাড়ী। (Lat, vehiculum ইংরাজী vehicle.) ছেদনার্থক লু ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া লবিত্র হইয়াছে, অর্থ—যাহা দ্বারা ছেদন করা যায়, কাটারি। খন্ ধাতুর উত্তর ইত্র প্রত্যয় করিয়া খনিত্র হইয়াছে, অর্থ যাহা দ্বারা খনন করা যায়। পাণিনি ইহাদের জন্য সূত্র করিয়াছেন অর্তিলূধূসূখনসহচর ইত্রঃ ৩।২।১৮৪

সুতরাং দেখা গেল চরিত্র শব্দের প্রাথমিক অর্থ চরণ। বেদে আমরা এই অর্থেই চরিত্র শব্দের প্রয়োগ পাই। যেমন, চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদি পর্ণম্—পাখীর ডানার মত বিশপলার পা ছিন্ন হইয়াছিল। তাহার পর চরিত্র শব্দের অর্থ হইল—কার্যক্ষেত্রে বিচরণ অর্থাৎ আচরণ, কার্যকলাপ, ইংরাজীতে যাহাকে behaviour বা conduct বলে। সংস্কৃতে character বা স্বভাব অর্থে চরিত্র শব্দ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এই অর্থে কথন কথন চরিত্র শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই জন্য বাংলায় আমরা বলি স্বভাব চরিত্র—character and conduct.

ইংরাজীতে character শব্দটি গ্রীক খর্ ধাতু (kharassem) হইতে আসিয়াছে। ধাতুটির অর্থ ধারাল করা, অঙ্কিত করা, ক্ষোদিত করা। এই ধাতুনিষ্পন্ন গ্রীক্ kharakter শব্দের অর্থ—মুদ্রিত চিহ্ন, চিহ্ন। ইহা লাটিনে character হইল। অর্থ—দাগ দিবার যন্ত্র, চিহ্ন, প্রকার, রীতি। ইংরাজীতেও প্রথমতঃ চিহ্ন, অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইত। বর্ণমালা বা অক্ষরকে এখনও character বলা হয়। তাহার পর অর্থ হইল বিশেষক চিহ্ন, বিশেষ গুণ। তাহার পর অর্থ হইল—বিশেষ গুণসমূহের সমষ্টি, স্বভাব, প্রকৃতি।

Butter ও Buttery

Butter (মাখন) Buttery (খাদ্য রাখিবার স্থান) এই দুইটি শব্দের জন্মগত কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে কাকজাতীয় rook এরা থাকে তাহাকে rookery বলা যায়, যেখানে কাটিবার যন্ত্রপাতি থাকে তাহাকে cultery বলে, যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে, আর যেখানে বোতল, পিপা প্রভৃতি থাকে তাহাকে buttery বলে। যেখানে শুধু butter বা মাখন থাকে তাহাকে buttery বলে না, pantry-তেই butter থাকে। সুতরাং butter শব্দের সহিত buttery-র কোন সম্বন্ধ নাই। Bottle ও butler শব্দ Buttery-র জ্ঞাতি। ফরাসী ভাষার bouteillerie (যে স্থানে বোতল পিপা প্রভৃতি রাখা হয়) হইতে Buttery আসিয়াছে।

Pan ও Pantry

অনেকের ধারণা যেখানে pan বা কড়া থাকে তাহাকে pantry বলে, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ল্যাটিন panetus শব্দের অর্থ ছোট রুটি, সুতরাং যেখানে রুটি প্রভৃতি থাকে তাহাকে pantry বলে।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ

কালীজীবন দেবশর্মা

প্রেমাবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণব জগতে যে অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দেয়, তাহাই ক্রমে সুসম্বদ্ধ হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দান করে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদেরই অন্যতম গ্রন্থমণি। আপাত-নীরস ব্যাকরণ-শাস্ত্রও যে কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত-ধারার অভিসেচন হইতে বঞ্চিত হয় নাই,, এই গ্রন্থ তাহারই নিদর্শন বহন করিতেছে।

সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে দেখিলে, স্বয়ং গৌরাঙ্গসুন্দরই এই রূপ ব্যাকরণ-রচনার আত্মি-প্রেরণাদাতা। তাঁহার সময়ে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। ফলে এখানকার ব্যাকরণ-ক্ষেত্রে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল কলাপ ব্যাকরণের। চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থের বর্ণনা হইতে জানা যায়, 'নিমাই পণ্ডিত' মুখ্যতঃ ব্যাকরণ-শাস্ত্রেরই অধ্যাপনা করিতেন, এমন কি তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের বর্ণনাতেও ব্যাকরণ অধ্যয়নের কথাই প্রধান ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে এই ক্ষেত্রে তিনিও টীকা-পঞ্জী-সমন্বিত কলাপ ব্যাকরণেই সমধিক পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য-ভাগবতে—

"নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনী॥
ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ।
তাঁর ঠাঁই পড়িতে প্রভুর সমীহিত॥
... ...
জিজ্ঞাসা করহ বৃদ্ধি কার কোন্ বৃদ্ধি।
বৃত্তি পাঁজি টীকার যে জানে দেখি শুদ্ধি॥
ধাতুসূত্র বাখানহ বলে সে পড়ুয়া।
প্রভু বলে বাখানি যে শুন মন দিয়া॥
... ...
আপনি করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।"

—আদি খণ্ড, ৭ম অধ্যায়

চৈতন্যচরিতামৃতে—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ॥
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।

চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীনা" ১।১৫।৩-৪

ঐ পঞ্জী ও টীকা যথাক্রমে ত্রিলোচন দাস রচিত 'কাতন্ত্রবৃত্তি-পঞ্জিকা' এবং দুর্গসিংহ রচিত কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা'। কলাপ (বা কাতন্ত্র) ব্যাকরণের চর্চায় এই দুই গ্রন্থ অপরিহার্য। 'ব্যাখ্যাপদী' নামে এক ব্যাকরণ গ্রন্থের কর্তৃত্ব গঙ্গাদাস আরোপিত হইতে দেখা যায়। তবে ইনিই চৈতন্যদেবের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত কিনা সন্দিগ্ধ বলা যায় না। মহাপ্রভু রচিত (কলাপ) রত্নাকরের ১২শ তরঙ্গে বর্ণিত আছে—

"দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈঞা চমৎকার।
ব্যাকরণের করক টিপ্পনী আপনার ।।"

অন্যত্র—

"উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী।"
লই পড়ি পড়াই শুনহ বিজমণি ।।"

ঈশান নাগর-রচিত 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থ হইতে জানা যায়, নিমাই পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন এবং তাঁহার টীকার নামও ছিল 'বিদ্যাসাগর' টীকা।—

"বিদ্যাসাগর উপাধিক নিমাই পণ্ডিত।
বিদ্যাসাগর নামে টীকা যাহার রচিত ।।—১২শ অধ্যায়

এই অদ্বৈতপ্রকাশ খ্রীঃ ১৫৪৮ অব্দে রচিত বলিয়া অনুমিত। দিগ্‌ বিজয়ী পণ্ডিতও প্রথমে অবজ্ঞাভরে নিমাইকে বলিয়াছিলেন—

"ব্যাকরণ পড়হ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম ।।
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের আলাপ ।। ১।১৬।২৯-৩০
ব্যাকরণীয়া তুমি নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার।" ১।১৬।৪৭

চৈতন্য চরিতামৃত

এই নিমাই পণ্ডিতই গয়াধাম হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া অন্য রূপ ধারণ করিলেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে এত বেশী মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন যে ছাত্রদের নিকট অধ্যাপনা করিতে বসিয়াও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের কৃষ্ণমূলক ব্যাখ্যা দিতে লাগিলেন—

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম ।।
প্রভু বলে সর্বকালে সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন ।।"

চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়

ঐ যে "সূত্র-বৃত্তি-টীকায় সকল হরিনাম"—এই ভাবাদর্শই হরিনামামৃত ব্যাকরণের মূলমন্ত্র বা

বীজ। মোটকথা, কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট গৌরাঙ্গসুন্দরের ঐ ভাব-বিহ্বল ব্যাখ্যান-রীতিরই আদর্শে উহারই অপেক্ষাকৃত বাস্তব বা কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা হরিনামামৃত ব্যাকরণে অনুস্যূত হইয়া আছে। ইহার সমর্থনে

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তচ্ছাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ।।"

জৈমিনি-ভারতের এই নিষেধ-বিধি তো আছেই। তাই ব্যাকরণের পাঠ নেওয়ার সময়েও যাহাতে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে হরিনাম-সম্বলিত ব্যাকরণের পরিকল্পনা, কারণ

"সাংকেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ।।"—ভাগবত ৬।২।১৪

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই ব্যাকরণের সূত্র এবং উদাহরণ প্রভৃতিতে বিশেষতঃ সংজ্ঞাসমূহে যতদূর সম্ভব হরি ও তদানুষঙ্গিক দেব-দেবীর নাম ব্যবহার করা হইয়াছে।•

হরিনামামৃত ব্যাকরণের দুইটি রূপ—একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, অপরটি বৃহৎ। সংক্ষিপ্তের সমস্তটাই বৃহতে অনুপ্রবিষ্ট। টীকাকার হরেকৃষ্ণাচার্যের মতে পরম ভাগবত সনাতন গোস্বামী সর্বপ্রথম ঐ সংক্ষিপ্ত রূপটি প্রস্তুত করেন এবং পরে উহাকে পরিবর্ধিত করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী বর্তমান প্রচলিত বৃহদাকার দান করেন—

".....সদা হরিরস-লুব্ধমানাসানামনধীত-ব্যাকরণানামধীতেতর
ব্যাকরণানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং হিতাভিলাষপরবশতয়া শ্রীনামগ্রহণ
পূর্বক-বিশিষ্টবৃৎপত্তি-বাঞ্ছয়া শ্রীকৃষ্ণদেবপ্রসাদমধিগম্য
শ্রীমজ্জীব সনাতন গোস্বামিনাং সূত্রানুসারেণ শ্রীজীবগোস্বমি-
নামা গ্রন্থকারঃ পরমমঙ্গলরূপ-মনোহর-মধুর-হরিনামাবলিভিঃ
সংকেতী কুর্বন্ শ্রীহরিনামামৃতাখ্য-বৈষ্ণব-ব্যাকরণমারভমাণঃ....."

ইত্যাদি। কোথাও আবার সনাতন-ভ্রাতা শ্রীরূপ গোস্বামীতে ঐ সংক্ষিপ্ত রূপটির কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে। আবার অনেকের মতে স্বয়ং শ্রীজীবই প্রথমে ঐ ক্ষুদ্র ব্যাকরণ রচনা করিয়া পরে উহাকে বৃহদাকার দান করেন।

বর্তমান মালদহ জেলার রামকেলি গ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ-বংশে ১১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীবের (১৫১১—১৫৯৬) জন্ম। মালদহ রেলষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীন গৌড়ের নিকট এই রামকেলি গ্রাম। শ্রীজীবের পিতা শ্রীবল্লভ বা অনুপম ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণব রূপ--সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভাগবতের লঘুতোষিণী টীকার উপসংহারে শ্রীজীব বর্ণিত নিজবংশ-পরিচয় হইতে জানা যায়, তাঁহার উর্ধতন ৮ম পুরুষ 'জগদ্‌গুরু' সর্বজ্ঞ দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটদেশীয় (বর্তমান মহীশূর তথা কর্ণাটক প্রদেশভুক্ত) অগ্রগণ্য এবং দেখানকার রাজা ছিলেন। এই কর্ণাটক হইতেই গৌড়ের সেন-বংশীয় রাজাদের পূর্বপুরুষগণের আগমন ঘটে। সর্বজ্ঞের প্রপৌত্র পদ্মনাভ গঙ্গাতীরবর্তী নবহট্টে (বঙ্গদেশের নৈহাটীতে) আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পৌত্র কুমারদেব নৈহাটী ত্যাগ করিয়া বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বরিশাল জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে

আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারই তিন পুত্র সনাতন (১৪৬৪—১৭৭৪ খ্রীঃ), শ্রীরূপ (১৪৭০—১৫৫৪) এবং অনুপম (১৪ ৩—১৫১৫)।১ সনাতনাদি নাম তিনটি মহাপ্রভুর দেওয়া। পিতৃদত্ত নাম যথাক্রমে অমরদেব, সন্তোষদেব এবং শ্রীবল্লভ। ইহাদের পিতামহ মুকুন্দ গৌড়ে রাজকার্য গ্রহণ করেন। ক্রমে গৌড়ের রাজা আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (বা হুসেন খাঁ সৈয়দ)—ইহার রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ—সনতনাদি তিন-ভ্রাতাকে পূর্বোক্ত রামকেলি গ্রামে আনিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি দানপূর্বক স্থাপন করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হয়। শ্রীজীবের পিতা অনুপম ছিলেন রাজার টাঁকশালের অধ্যক্ষ। নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে'র প্রথম তরঙ্গে এই সকল কথা বিশদ ভাবে কথিত আছে।

অল্প বয়সেই শ্রীজীবের ব্যাকরণাদি নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের সূচনা হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সনাতনাদির মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে তাঁহারা রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হন। এই সময়ে শ্রীজীব, পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের সহিত বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসেন। তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা। পিতা জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের ন্যায় দীর্ঘজীবী ছিলেন না। বৃন্দাবন হইতে লীলাচলে যাইবার পথে গৌড়ে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতোয়াবাদ ও নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবনের পথে কাশীধামে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া মধুসূদন বাচস্পতির নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন (ভ. র. ১।৭৭১-৭৮) এবং বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের নিকট ভক্তিশাস্ত্রাদিতে শিক্ষিত হন। এই সময়েই তাঁহার প্রতিভার সম্যগ বিকাশ হয়। অসাধারন পণ্ডিতাবলে তিনি বিচার-মল্ল অদ্বিতীয় তার্কিক হইয়া উঠেন। দক্ষিণদেশীয় এক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। বিচার আরম্ভের পূর্বমুহূর্তে এই পণ্ডিত শ্রীজীবের সন্ধানে যমুনার ঘাটে আসিয়া তাঁহাকে স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া বিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে তিনি এই শ্লোক দুইটি মাত্র উচ্চারন করিয়াছিলেন—

"হৃদয়াকাশে চিদানন্দঃ সূর্যোভাতি নিরন্তরম্।
উদয়াস্তং ন পশ্যামি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥
সদ্‌ভক্তির্হিতা জাতা মায়া-ভার্যামৃতাহধুনা।
অশৌচং দ্বয়মাপ্নোতি কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে।"

ক্রমে এই তর্কপ্রিয়তার জন্য তাঁহাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর বিরাগভাজনও হইতে হয়। বল্লভী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বল্লভ ভট্ট (বল্লভাচার্য) যমুনায় স্নানে যাইবার পথে একদা রূপ গোস্বামিপাদকে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত জানিয়া অযাচিত ভাবেই "আমি এই গ্রন্থ সংশোধন করিয়া দিব" বলিয়া যমুনায় চলিয়া গেলে নিকটবর্তী শ্রীজীব আচার্যের এই দম্ভোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া জল আনিবার ছলে তৎক্ষণাৎ যমুনায় গিয়া তাঁহাকে উক্ত গ্রন্থের কোথায় ভুল আছে জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ের মধ্যে যে শাস্ত্রযুদ্ধের অবতারণা হয় তাহাতে "শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবারে" (ভ. র ৫। ১৬৩৫) ফিরিবার সময় তিনি রূপ গোস্বামীর নিকট শ্রীজীবের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলে দৈন্যাবতার শ্রীরূপ তাঁহার তর্কপ্রবণতায় দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। কিছুদিন

পরে নন্দঘাটে উপবাস-কিষ্ট ম্রিয়মান শ্রীজীবকে দেখিতে পাইয়া সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া আসেন এবং অগ্রজের আজ্ঞায় শ্রীরূপও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া স্বয়ং শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তোলেন। তর্কে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা যে বৈষ্ণবোচিত দীনতার প্রতিবন্ধক হয় তাহা শিক্ষা দেওয়াই ছিল শ্রীরূপের ঐরূপ কঠোর আচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভক্তিরত্নাকরে সনাতন ও রূপ গোস্বামীর নামে যে সব গ্রন্থের উল্লেখ আছে, সে সবের মধ্যে লঘু-হরিনামামৃতের নাম পাওয়া যায় না। সেখানে শ্রীরূপ রচিত ১৬ খানি গ্রন্থের মধ্যে ব্যাকরণের ধাতু বিষয়ক যে প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা পুস্তকের দাম করা হইয়াছে তাহাই একমাত্র ব্যাকরণ-বিষয়ক রচনা—

'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থরসপূর।
প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা গ্রন্থসমধুর॥' ১।৮.৬

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরত্নাকরে যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও অনুরূপ বর্ণনাই রহিয়াছে —'উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা' (৮২৭) ইত্যাদি। আসলে কিন্তু এই গ্রন্থের নাম 'প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী'। ভট্টমল্ল রচিত 'আখ্যাতচন্দ্রিকা' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে শ্রীরূপ গোস্বামী এই পুস্তক (ক্রিয়াকোশ) রচনা করেন। ইহার প্রথম ও শেষ শ্লোক দুইটি লক্ষণীয়—

'ভট্টমল্লৈর্বিরচিতা যাদ্ভুতাখ্যাতচন্দ্রিকা।
ততঃ সংগৃহ্যতে প্রায়ঃ প্রযুক্তোধাতুসঞ্চয়ঃ॥
মুদা যথার্থনাম্নীয়ং কবিসারঙ্গরঙ্গদা।
সেব্যতাং কোবিদগণৈঃ প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী॥'

ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত শ্রীজীব রচিত ২৫ খানা গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই হরিনামামৃত ব্যাকরণের নাম করা হইয়াছে—

"শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃতব্যাকরণ দ্বিব্যরীত॥ ১।৮৩৩
সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চনদীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার॥ ১।৮৩৪

ইহার আনুষঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোক—

'শ্রীমদ্‌বল্লভপুত্র শ্রীজীবস্য কৃতিষুত্ততে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতংতথা॥
তৎসূত্রমালিকাতত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।'

প্রথমে উল্লেখ করা হইলেও এই ব্যাকরণ শ্রীজীবের শেষ বয়সের রচনা। ভক্তিরত্নাকরের ১৪শ তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্যকে লেখা শ্রীজীবের যে পত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার প্রথম দুই পত্রে হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংশোধন এবং নবদ্বীপে প্রেরণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'……শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টানি ২ বর্ত্তন্ত ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানুকূল্যেন প্রস্থাপ্যানি'—১ম পত্র। দ্বিতীয় পত্রে—পূর্বং যদ্ হরিনামামৃত-ব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থাপিতমাসীৎ তদ্ যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদি বৃত্তাদি

দৃষ্ট্যা ভ্রমাদিকং শোধ্যম্ ।'

১ম পত্রে উল্লিখিত 'উত্তরচম্পূ'—শ্রীজীব রচিত 'শ্রীগোপালচম্পূ' নামক বিশাল চম্পূকাব্যের উত্তরাংশ—যাহার রচনা সমাপ্ত হয় ১৫১৪ শকাব্দের বৈশাখ মাসে। ইহা খ্রীষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের ঘটনা। উত্তর চম্পূর সহিত একত্রে হরিনামামৃতেরও সংশোধন কিছু বাকী থাকার কথায় অনুমান করা যাইতে পারে যে উহারও রচনা সমাপ্তিকাল ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে। কাজেই এই ব্যাকরণ শ্রীজীবের শেষ বয়সের রচনা এবং দ্বিতীয় পত্র হইতে প্রমাণিত হয়, তাঁহার জীবৎকালেই ইহার পঠন-পাঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল) সম্ভবতঃ এই কারণেই ভক্তদের আগ্রহাতিশয্যে ইহার অশোধিত গ্রন্থই নবদ্বীপে পাঠাইতে হইয়াছিল এবং ইহার যথাভিপ্রেত সংশোধনাদি তাঁহার দেহত্যাগের (১৫৯৬ খ্রীঃ) পূর্বে বা আদৌ সম্পূর্ণ করা হইয়াছিল কি না জানা যায় নাই।

'হরিনামাবলি বলিতং ব্যাকরণং বৈষ্ণবার্থমাচিন্ম' বলিয়া শ্রীজীব এই ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং শেষে লিখিয়াছেন—

'যদত্র ব্যক্তমুক্তং ন ভ্রান্তং বা তদশেষতঃ।
জ্ঞেয়ং শোধ্যঞ্চ বিজ্ঞেভ্যো বিজ্ঞশাস্ত্রাবলোকতঃ ॥'

একজন গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিনয়ের প্রকাশ বোধহয় সম্ভব নয়। পরে লিখিয়াছেন—

'ভগবন্নাম-বলিতা ভগবদভক্তিচ্ছতৎপরৈঃ।
বৃন্দাবনস্থজীবস্য কৃতিরেষা তু গৃহ্যতাম্ ॥
ছান্দসা প্রচরদ্রূপ-রূঢ়শব্দান্ বিনাময়া।
তত্রালেখি তদিচ্ছাচেদ্দৃশ্যোহন্যঃশাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥
হরিনামামৃতসংজ্ঞং যদর্থমেতৎপ্রকাশয়ামাসে।
উভয়ত্র চ মম মিত্রংস ভবতু গোপালদাসাখ্যঃ ॥'

এই গোপালদাস—যাঁহার জন্য এই ব্যাকরণের রচনা—ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের পুত্র। ইহার পূর্বনাম ধীরহাম্বীর। ইহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য এবং পরম ধার্মিক। শ্রীজীব ধীর হাম্বীরকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার 'গোপালদাস নাম শ্রীজীবেরই দেওয়া। গোপালদাস তাঁহার রাজ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিবে তাহাকে ভীষণ শাস্তি পাইতে হইবে। ফলে প্রবাদ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—

"গোপালের কালে রাজার মহলে
কুক্কুটেও বলে হরি।"

তিনি আদর্শস্থানীয় পরম বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই শ্রীজীব কেবল ইহকালে নয়, পরকালেও ('উভয়ত্র') তাঁহার মিত্রতা কামনা করিয়াছিলেন, ইহা গোপালের কাছে যে কত বড় গৌরবের কথা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

হরিনামামৃত ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা মোট ৩১৯২। প্রকরণের সংখ্যা ৭—(১) সংজ্ঞা-সন্ধি-প্রকরণ,

(২) বিষ্ণুপদপ্রকরণ (শব্দরূপ), (৩) আখ্যাতপ্রকরণ (ধাতুরূপ), (৪) কারকপ্রকরণ, (৫) কৃদন্তপ্রকরণ, (৬) সমাসপ্রকরণ ও (৭) তদ্ধিতপ্রকরণ। লঘু হরিনামামৃতের প্রকরণ-বিভাগও এই রূপ, তবে ইহার সূত্রসংখ্যা একত্রে ৭৫৭।

মূলতঃ পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণের অনুসরণে রচিত হইলেও এই ব্যাকরণে পাণিনির প্রত্যাহার (বর্ণসংক্ষেপ) গৃহীত হয় নাই, কলাপের সিদ্ধবর্ণপাঠই (অর্থাৎ অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি ক্রমে বর্ণের প্রচলিত পাঠ) হরিনামময় সূত্রসমূহ অনুসৃত হইয়াছে। স্থল বিশেষে পাণিনির সূত্র সমূহ অবিকল রাখিয়া এবং কোথাও বা সামান্য পরিবর্তন করিয়া ব্যাকরণভুক্ত করা হইয়াছে। পাণিনি (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) হইতে আরম্ভ করিয়া সুপদ্ম ব্যাকরণ (খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী) পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাকরণ-ক্ষেত্রের যাবতীয় প্রধান গ্রন্থ ও বিশিষ্ট মতের আলোচনাপূর্বক রচিত হইলেও ইহার রচনা-শৈলী, বিশেষতঃ বৃত্তি-ভাগ (অর্থাৎ ব্যাখ্যাংশ) অতিশয় প্রাঞ্জল। উণাদি-প্রক্রিয়া অতি সংক্ষিপ্ত ; ইহা কৃদন্ত-প্রকরণের মাত্র ১০টি সূত্রের (৩:৬—৭৫) আশ্রয়ে রচিত। বৈদিক প্রক্রিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত "ছান্দসাপ্রচরদ্রূপ..." ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীজীব স্বয়ং বলিয়াছেন, এই ব্যাক েে বৈদিক ও অপ্রচলিত রূঢ় শব্দসমূহ আলোচিত হয় নাই, ইচ্ছা হইলে সেই সব অন্য ব্যাকরণ হইতে জ্ঞাতব্য। স্থল-বিশেষে গোস্বামিপাদ সারস্বত ও প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রভৃতি অন্য ব্যাকরণের ভুল-ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কোথাও বা বিভিন্ন সাহিত্য ও ব্যাকরণ গ্রন্থাদি হইতে প্রচুর উদাহরণ ও মতান্তর প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া সেইগুলির সমালোচনাপূর্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। সূত্রের আক্ষরিক সংক্ষেপের জন্য বৈয়াকরণদের চির-কাম্য যে 'মাত্রা-লাঘব' তাহাকেও তিনি নির্দ্বিধায় তিরস্কার করিয়াছেন। সংজ্ঞা-প্রকরণের ২নং সূত্রের বৃত্তিতে তিনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

মাত্রা-লাঘবমাত্রং পুত্রোৎসব ইতি পরেঽভিমন্যতে।
হরিনামাক্ষর-লাভাদ্ বয়ং ত্বমূদৃক্ তিরস্কুর্মঃ।

অর্থাৎ অন্য পণ্ডিতেরা কেবল মাত্রালাঘব হইলেই পুত্রোৎসব জ্ঞান করেন ; কিন্তু আমরা হরিনামাক্ষর লাভ করিতে পারিলেই ঐরূপ লাঘবকে তিরস্কার করি।'

শিব বা ব্রহ্মা হইতে বর্ণমালার উৎপত্তি কথনের চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া নারায়ণ হইতে বর্ণক্রমের উদ্ভব ঘোষণার দ্বারা এই ব্যাকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে—"নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ" (১।১)। কলাপ (বা কাতন্ত্র) ব্যাকরণের আরম্ভে এই বর্ণক্রমকেই 'বর্ণসমাম্নায়' আখ্যা দিয়া ইহাকে সিদ্ধ বা চিরপ্রসিদ্ধ বলা হইয়াছে—"সিদ্ধোবর্ণসমাম্নায়ঃ" (১।১)। হরিনামামৃতের বর্ণক্রম—অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ। ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। চ্, ছ্…য্, র্, ল্, শ্, ষ্, হ্, ক্ষ্। সর্বশেষে 'ক্ষ'র গ্রহণ লক্ষণীয়। বৃত্তিভাগে বলা হইয়াছে—'এতে বর্ণাঃ, অক্ষরাণি অলঃ চ'। অল্= অ হইতে হ্ পর্যন্ত সমস্ত বর্ণ বুঝাইতে পাণিনীয় সংজ্ঞা। শ্রীজীব হরিনামাত্মক সংজ্ঞা (Technical terms) বিধানপূর্বক প্রায় প্রত্যেক স্থলেই কাতন্ত্র এবং পাণিনি-ব্যাকরণ-সম্মত সংজ্ঞাটিও দেখাইয়াছেন। যেমন, ২য় সূত্র "তত্রাদৌ চতুর্দশ সর্বেশ্বরাঃ"। ইহার বৃত্তিতে—'এতে স্বরাঃ অচঃ চ।' অর্থাৎ পূর্বোক্ত বর্ণক্রমের প্রথম চোদ্দটির (হরিনামামৃত ব্যাকরণে যাহাদিগকে 'সর্বেশ্বর' নাম দেওয়া হইয়াছে) কলাপ এবং পাণিনি-সম্মত সংজ্ঞা যথাক্রমে 'স্বর' এবং 'অচ্'। যে স্থলে কাতন্ত্রের (—

কলাপের) তদনুরূপ সংজ্ঞা নাই সেক্ষেত্রে কেবল পাণিনির সংজ্ঞাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যেমন ১১শ সূত্রে ও তাহার বৃত্তিতে—"ই ঈ উ ঊ চতুঃসনাঃ" (১।১১)। 'ইণঃ চ'। এখানে ই ঈ উ ঊ বর্ণের শ্রীজীবকৃত সংজ্ঞা চতুঃসন, পাণিনীয় সংজ্ঞা ইণ্; কাতন্ত্রে এই স্থলের জন্য কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন হয় নাই। নিম্নে হরিনামামৃতের কয়েকটি লক্ষণীয় সংজ্ঞা প্রদর্শিত হইল—দশাবতার = অ হইতে ৯৯ পর্যন্ত দশটি ('সমান') বর্ণ ; একাত্মক = সবর্ণ, যেমন অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ইত্যাদি ; বামন = হ্রস্ব, ত্রিবিক্রম = দীর্ঘ, মহাপুরুষ = প্লুত, ঈশ্বর = ই—ঔ পর্যন্ত ১২টি নামী বর্ণ ; ঈশ = ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ ; অনন্ত = অ আ ই ঈ উ ঊ ; চতুর্ভুজ = ঊ ঊ ঋ ৠ ; চতুর্ব্যূহ = এ ঐ ও ঔ ; বিষ্ণুচক্র = ং ; বিষ্ণুচাপ = ঁ, বিষ্ণুসর্গ = ঃ ; বিষ্ণুজন = ক্—হ্ পর্যন্ত সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ ; হরিকমল = ক্ চ্ ট্ প্ ; হরিখড়্গ = খ্ ছ্ ট্ থ্ ফ্ ; হরিগদা = গ্ জ্ ড্ দ্ ব্ ; হরিগঙ্গা স্ জ্ ড্ দ্ ব্ ; হরিঘোষ = ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ ; বিষ্ণুদাস = ক্ থ্ গ্ ঘ্ চ্ ছ্ জ ঝ্ ইত্যাদি প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণ ব্যতীত মোট ২০ বর্ণ ; হরিমিত্র = য্ র্ ল্ ব্ ; হরিগোত্র = শ্ ষ্ স্ হ্ ; সূত্র করিয়াছেন—"বিষ্ণুদাস-হরিগোত্রাণি বৈষ্ণবাঃ" (১।৩০) অর্থাৎ পূর্বোক্ত ২০ বর্ণ এবং শ্ ষ্ স্ হ্ = বৈষ্ণব সংজ্ঞায় অভিহিত ; "হরিগদা-হরিঘোষ-হরিবেণু-হরিমিত্রাণি হশ্চ গোপালঃ" (১।৩১) অর্থাৎ গোপাল = সমস্ত ঘোষবদ্‌বর্ণ ; যাদব = অঘোষবর্ণ, রাম = বর্ণস্বরূপ, যেমন অকার ইকার না বলিয়া অরাম, ইরাম ইত্যাদি বলিতে হইবে ; বিরিঞ্চি = আদেশ ; বিষ্ণু = আগম ; হর = লোপ ; বিষ্ণুভক্তি—বিভক্তি ; পুরুষোত্তম লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ ; লক্ষ্মীলিঙ্গ = স্ত্রী-লিঙ্গ ; ব্রহ্মলিঙ্গ = ক্লীবলিঙ্গ ; কৃষ্ণনাম = সর্বনাম ; পরপদ = পরস্মৈপদ ; আত্মপদ = আত্মনেপদ ; মিশ্রপদ = উভয়পদ; কৃষ্ণধাতুক = সার্বধাতুক ; অচ্যুত = লট্, বিধি = বিধিলিঙ্ ; বিধাতা = লোট্ ; ভূতেশ্বর = লঙ্ ; ভূতেশ = লুঙ্ ; অধোক্ষজ = লিট ; বালকল্কি = লুট্ ; কামপাল = আশীর্লিঙ্ ; কল্কি = ল়ৃট ; অজিত = লৃঙ ; রামধাতুক = আর্ধধাতুক ; উপেন্দ্র = উপসর্গ ; উদ্ধব = উপধা ; কৃষ্ণ = অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ ; কৃষ্ণপুরুষ = তৎপুরুষ ; শ্যামরাম = কর্মধারয় ; ত্রিরামী = দ্বিগু ; পীতাম্বর = বহুব্রীহি ; রামকৃষ্ণ = দ্বন্দ্ব ; কৃষ্ণপ্রবচনীয় = কর্মপ্রবচনীয় ; কৃষ্ণস্থান = ঘুট্ ; কেশব = টিং ; গোপী = ঈ ও ঊ কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ; গোবিন্দ = গুণ ; চক্রপাণি = যঙ্লুগন্তধাতু ; নারায়ণ = দ্বিরুক্তধাতুর পরভাগ ; নৃসিংহ = ণিং , পাণ্ডব = স্বাদিপঞ্চবিভক্তি ; বুদ্ধ = সম্বোধনে সু ; মাধব = টণিং, রাধা = আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গশব্দ ; বিভু = নামধাতুপ্রত্যয় ; বিষ্ণুনিষ্ঠা = ক্তবতু ; বিষ্ণুপদ = পদ ; বিষ্ণুবর্গ = কাদিপঞ্চবর্গ ; বৃষ্ণীন্দ্র = বৃদ্ধি ; শিব = শিং প্রভৃতি।

একটু ধৈর্য ধরিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে গ্রন্থকার যদৃচ্ছাক্রমে কেবল দায়সারার তাগিদেই এই সব সংজ্ঞার ব্যবহার করেন নাই ; বরং প্রত্যেকটি সংজ্ঞা-নির্দেশের ক্ষেত্রে তিনি গভীর মননশীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। সংজ্ঞীর (অর্থাৎ বিষয়ের) ব্যাকরণগত বৈশিষ্টের সঙ্গে সেই সংজ্ঞীর সংজ্ঞা-নির্দেশক নামের অধিকারী দেব-দেবী বা বস্তুর ঐতিহ্যগত চরিত্র বা ক্রিয়াকলাপের মিল বা সামঞ্জস্য যতদূর সম্ভব রক্ষা করিয়াই এই সংজ্ঞা-গঠন-কার্য সমাধা করা হইয়াছে। নাম ও নামীয় বা সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীয় অভেদ-কল্পনাও এই নির্বাচনের মূলে কম প্রেরণা যোগায় নাই। মোটকথা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে বসিয়া সংজ্ঞার তাৎপর্য-চিন্তার মধ্য দিয়া শব্দ-চরিত্র তথা দেব-চরিত্র-মননের পরমলাভ —ব্যাকরণের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। বিচিত্র ধারায় গ্রন্থকার এই সুফল লাভের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

স্থলে স্থলে নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া তিনি এই ফল হাতে হাতে ধরাইয়া দিতেও কার্পণ্য করেন নাই। সংজ্ঞা-প্রকরণের ৩৯—৪১ সংখ্যক সূত্র-তিনটির বৃত্তি-ভাগে দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই সূত্রগুলিতে যথাক্রমে আদেশের জন্য 'বিরিঞ্চি', আগমনের জন্য 'বিষ্ণু' এবং লোপের জন্য 'হর' সংজ্ঞা নির্দেশিত' হইয়াছে। বিরিঞ্চি'র ব্যবহারের কারণ দেখাইতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—'বিরিঞ্চির্ব্রহ্মা যথৈকং বস্তুপাদায় অন্যৎ করোতি, তথা যে বিধিঃ প্রবর্ততে স আদেশো বিরিঞ্চিশ্চোচ্যতে।' 'বিষ্ণু' সংজ্ঞার ব্যবহারের কারণ বলিয়াছেন—'বিষ্ণুর্যথা মধ্যতঃ স্বয়মাবির্ভূয় পোষকো ভবতি, তথা যো বিদিঃ প্রবর্ততে স আগমঃ, বিষ্ণুশ্চোচ্যতে।' এই রূপ লোপের 'হর' সংজ্ঞার নির্দেশের কারণ—'হরো যথা নাশহেতুর্ভবতি, যথা যো বিধি প্রবর্ততে স লোপঃ, হরেশ্চোচ্যতে। তত্র হরো দ্বিধা ভবেৎ—তত্রাদর্শনমাত্র-হেতুর্হরঃ, আত্যন্তিকলয়হেতুর্মহাহরঃ।' এই তিন স্থলে আদেশ, আগম ও লোপের ব্যাকরণ-ঘটিত বৈশিষ্টের সহিত যথাক্রমে বিরিঞ্চির (ব্রহ্মার) কারকতা, বিষ্ণুর পোষকতা এবং হরের নাশকতার সাদৃশ্য হেতু ব্যাকরণের অনুরূপ কার্যের নাম কারণে উহাদের প্রয়োগ সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বহুব্রীহির জন্য 'পীতাম্বর' সংজ্ঞা-বিধানের মূলানুসন্ধানে দেখা যায়, বিষ্ণু-বাচক পীতাম্বর শব্দটি নিজেই বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন পদ। এই রূপ কর্মধারয়, দ্বিগু এবং দ্বন্দ্ব সমাসের জন্য যথাক্রমে 'শ্যাম-রাম', 'ত্রিরামী' এবং 'রামকৃষ্ণ' সংজ্ঞার প্রয়োগ খুবই সার্থক। ভবিষ্যৎকাল-সূচক 'ল়ৃট্'-কে (কাতন্ত্রের 'ভবিষ্যন্তী') 'কল্কি' সংজ্ঞায় অভিহিত করার পশ্চাতে রহিয়াছে ভবিষ্যতে কল্কিরূপে বিষ্ণুর অবতরণের কল্পনা। লট্, বিধিলিঙ্ লোট্, ইত্যাদি অন্যান্য ল-কারের জন্য 'অচ্যুত', 'বিধি', বিধাতা' প্রভৃতি সংজ্ঞা-নির্ধারণের মূলেও অনুরূপ গূঢ় সার্থকতা রহিয়াছে। এই রূপ সর্বত্র। স্থল বিশেষে পূর্বাচার্যাদের ব্যবহৃত সংজ্ঞাই বৈষ্ণব দৃষ্টিভক্তি হইতে বড় অর্থবহ হইয়া উঠিয়াছে, যেমন, সমাস-প্রকরণের সূত্র—"সমাসবাক্যং বিগ্রহঃ" (।৫)। এখানকার 'বিগ্রহ' সংজ্ঞাটি বিষ্ণু বিগ্রহের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। এই রূপ পদের ব্যাখ্যাজ্ঞাপক "বিষ্ণুভক্তিসিদ্ধং বিষ্ণুপদম্" (১।১১৫) সূত্রটি বড়ই চমৎকার হইয়াছে। 'বিষ্ণুভক্তি' = বিভক্তি', 'বিষ্ণুপদ' = পদ। ব্যাকরণশাস্ত্রে পদকে বিভক্তিযুক্ত বা বিভক্ত্যন্ত বলা হয়। সেই দিক ছাড়িয়া কেবল বিষ্ণুপাসক ভক্তের দৃষ্টি হইতেও সূত্রটি সার্থক, অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র রূপে গ্রহণ না করিয়াও ঐ বাক্যটির বাচ্যার্থের হানি হয় না, কারণ বিষ্ণুভক্তির দ্বারাই (ভক্তের পরমকাম্য) বিষ্ণুর শ্রীপদলাভ ঘটিয়া থাকে। আবার "প্রকৃতিঃ পূর্বা" (১।১৫৯) এবং "প্রত্যয়ঃ পর" (১।১৫১) সূত্রদ্বয় একত্রে ব্যাকরণ-শাস্ত্রীয় অর্থের অতিরিক্ত সাধারণ বস্তু-বিজ্ঞানের সত্যও প্রকাশ করিতেছে— প্রথমে প্রাকৃত জগৎ এবং পরে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভ্যুদয়।

কেবল সংজ্ঞার ব্যবহারই নয়, সূত্রের উদাহরণেও গ্রন্থকার বিষ্ণুর নাম ব্যবহার করিয়াছেন। সন্ধিপ্রকরণের ১ম সূত্র "দশাবতার একাত্মকে মিলিত্বা ত্রিবিক্রমঃ" (।৪৬)—যাহার অনুরূপ কাতন্ত্রসূত্র "সমানঃ সবর্ণে দীর্ঘী ভবতি পরশ্চ লোপম্"। ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'কৃষ্ণাগ্রে, রাধাগতা, হরীতি, বিষ্ণুদয়' প্রভৃতি। কোনো কোনো স্থলে কেবল সংজ্ঞাশব্দটির পরিবর্তন করিয়া কাতন্ত্র-ব্যাকরণের সূত্রকে অবিকল গ্রহণ করা হইয়াছে, যেমন—"উদ্বয়েও" (১।৫০)। এখানে কাতন্ত্রের "উবর্ণেঅ" সূত্রটিও বর্ণসংজ্ঞার স্থলে "তদাদিদ্বয়ে দ্বয়ম্" (১।৩৮) এই সূত্রানুসারে কেবল 'দ্বয়' সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া ঐ "উবর্ণেও" সূত্রটিকেই গ্রহণ করা হইয়াছে। হরিনামাত্মক সংজ্ঞা নির্বচনের ক্ষেত্রে

গ্রন্থকার যে সব বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্মরসগ্রাহী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন তন্মধ্যে, আমাদের বিবেচনায়, এই কয়টি প্রধান বলিয়া মনে হয়—(১) বৈষ্ণব দেবতার এবং তদানুষঙ্গিক যাবতীয় ভাব এবং বস্তুর নামাবলীর যত বেশী সম্ভব ব্যবহার, (২) বিষয়ের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যটি যাহাতে তদ্‌জ্ঞাপক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই স্মৃতিপথে উদিত হয় তদুপযোগি-স্বরূপ-বিশিষ্ট সংজ্ঞা-চয়ন, অর্থাৎ এককথায়—বিষয়ের সহিত সংজ্ঞার পারস্পরিক ঐতিহ্যগত তাদাত্ম্য, (৩) সংজ্ঞার মাধ্যমে তদ্বিষয়ক উদাহরণেরও প্রদর্শন, যেমন—দ্বিগুসমাসের জন্য ব্যবহৃত 'ত্রিরামী' সংজ্ঞাটি নিজেই দ্বিগুসমাস-নিষ্পন্ন একটি পদ, (৪) সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যসহ সংজ্ঞাসমূহের সাধারণভাবে দার্শনিক, সাহিত্যিক, অন্য শাস্ত্রীয় এবং ধর্মীয় চিত্তচমৎকারী ঐতিহ্যেরও অনুসরণ এবং (৫) সংজ্ঞার ব্যবহার নৈপুণ্যে সূত্র-বৃত্তি উদাহরণাদি-ঘটিত বাক্যে বা বাক্যাংশে ব্যাকরণাতিরিক্ত অন্য কোনও শাশ্বত সত্যের উপস্থাপনা।

শ্রীজীব গোস্বামীর অন্য দুই ব্যাকরণাত্মক গ্রন্থ 'সূত্রমালিকা' এবং 'ধাতুসংগ্রহ'—হরিনামামৃত ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থ। 'সূত্রমালিকা' পাওয়া যায় নাই। ইহা সম্ভবতঃ সূত্রগুলিকে কারিকা-নিবদ্ধ করিয়া রচিত হইয়াছিল। 'ধাতুসংগ্রহ'—এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। শেষে বলা হইয়াছে—

"অপ্রযুক্তাঃ পরে জ্ঞেয়া গ্রন্থাৎ কল্পদ্রুমাদিকাৎ।
হরিনামামৃতস্থৈষা সংক্ষেপাদ্ধাতুপদ্ধতিঃ।
ময়াকৃতা প্রযুক্তান্যধাতূংস্ত্যক্ত্বা কচিৎ কচিৎ॥"

শ্লোকোদ্ধৃত 'কল্পদ্রুম' বোধ হয় বোপদেব রচিত 'কবিকল্পদ্রুম' নামক বিখ্যাত ধাতুসংগ্রহের গ্রন্থ।

অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় হরিনামামৃতের টীকা-টিপ্পনীর সংখ্যা খুবই কম। ইহার প্রাঞ্জলতা এবং নির্দিষ্ট বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পঠন-পাঠনের সীমাবদ্ধতা বোধ হয় এই গ্রন্থ-বিরলতার কারণ। শ্রীজীব স্বয়ং এই ব্যাকরণের বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। সূত্রকার কর্তৃক সূত্রসমূহের ব্যাখ্যামূলক বৃত্তিরচনা একরূপ চিরাচরিত প্রথা। ইহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে বাঁকুড়া জেলায় সোনামুখী গ্রাম নিবাসী হরেকৃষ্ণ আচার্য 'বালতোষিণী' নামে হরিনামামৃতের এক বিস্তৃত টীকা আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারে নাই; সমাসপ্রকরণের ২৫৯ সূত্র পর্যন্ত টীকা রচনার পর ভবলীলা সম্বরণ করেন। পরে ১২৫৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে গোপীচরণ দাস বেদান্তভূষণ ঐ টীকারই সমাসপ্রকরণ পর্যন্ত সমাপ্ত করিয়া তদ্ধিত প্রকরণের 'তদ্ধিতোদ্দীপনী' টীকা প্রণয়ন করেন। বীরভূম ছিল তাঁহার পৈতৃক বাড়ি। টীকা রচনার সময় তিনি কেন্দুবিল্বে বাস করিতেছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেও পূর্বনাম ত্যাগ করেন নাই।

পরিশেষে তাঁহারই ভাষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 'ছয় গোসাঞি'র অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামিপাদের চরণযুগলে নমস্কার করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি—

"কৃতংযেন ভক্ত্যা পরেশ-প্রবেশং

সুশাস্ত্রং মহাবোধকং শব্দরূপম্।
হরের্নাম-সন্ধান শীলৈশ্চ সেব্যং
নমো জীবগোস্বামিনে নিত্যবস্তু॥""

---

* হরিনামামৃতমিতি ভঙ্গ্যা গ্রন্থনামাপি নির্দিষ্টং, হরিনামরূপমমৃত যত্র তৎ—"পিবন্তু রসিকাঃ সর্বে কৃষ্ণাখ্যং পরমামৃতমিতি" পাদ্মবচনাৎ। যদ্বা হরিনামভিস্তৎ কীর্তনাদিভিরমৃতং মুক্তিরবিদ্যা-মোচনং যস্মাৎ তৎ'।

—বালতোষণী টীকা

(১) সনাতনাদিরর এই সময়-নির্দেশ লইয়া মতবিরোধ আছে। এখানে আমরা শ্রীহরিদাস দাস-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের মতানুসরণ করিয়াছি। ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সনাতন ও রূপগোস্বামীর জীবৎকাল যথাক্রমে ১৪৮৪-১৫৫৮ এবং ১৪৯০-১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। ৺রাধাগোবিন্দ নাথ ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবরশাহের বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের সহিত সাক্ষাতের ঘটনাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন এবং ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১১৭ বৎসর বয়সে তাঁহাদের তিরোভাব সাব্যস্ত করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২৫-২৭

(২) এই পাঠই মুদ্রিত হইয়াছে ; হওয়া উচিত 'কানিচিদবশিষ্টানি…'।

স মা লো চ না

রবীন্দ্র-রচনা বীক্ষা (সংশয় কুণ্ঠিত নিবেদন) (১ম খণ্ড)—দেবব্রত মল্লিক। জিজ্ঞাসা—কলিকাতা ৯ ও ২৯ ; পৃঃ ২১৭ ; মূল্য কুড়ি টাকা।

বর্তমানে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-সাহিত্যই সর্বাধিক আলোচনার বিষয়। প্রতি বৎসরই এই আলোচনা গ্রন্থ-সূচীতে নূতন নূতন গ্রন্থকারের নাম সংযোজিত হচ্ছে। তবে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সমৃদ্ধি এতে ঘটছে কিনা সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। এই বইগুলির অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ব-সূরীদের উদ্ধৃতি পূর্ণ। আজকাল সবাই আচার্য, সুতরাং আচার্য অমুক এই বলেছেন, আচার্য তমুক এই বলেছেন এই ধরণের চাটুকারিতার পর উক্ত আচার্যদের গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিয়ে তথাকথিত গবেষক লেখকদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। তারপর বিজ্ঞাপনের চটকে কিছু বই পাঠকের হাতেও পৌঁছে যায়। তবে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়, এবং এই ব্যতিক্রম স্বভাবতঃই সৎ পাঠকের মনে তৃপ্তি এনে দেয়। 'রবীন্দ্র রচনা বীক্ষা' এই শেষোক্ত ধরণের রচনা। বইটির একটি 'উপ-নাম' বা 'সাব-টাইটেল' "সংশয় কুণ্ঠিত নিবেদন"। এই উপনামের প্রয়োজন ছিল কারণ এতে একদিকে যেমন লেখকের রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের সাক্ষ্য আছে, তেমনি আছে বেশ কিছু দুঃসাহসিকতার পরিচয়। রবীন্দ্র-চিন্তার প্রতি গভীর চিন্তাশীল হয়েও লেখক এই বইয়ে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ভ্রান্তির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমেই তিনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নানাস্থানে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।।"—এই শ্লোক দ্বয় দিয়ে তাঁর বক্তব্য সুরু করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন—যে কবির উদ্ধৃত রচনাটি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রথমটি পাওয়া যায় ঋগ্বেদ সংহিতায়, বাজসনেয়ি সংহিতায় এবং শ্বেতাশ্বতর ও তৈত্তরীয় সংহিতায়। দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় বাজসনেয়ি সংহিতায় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন কেন রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়েছিল আলোচ্য শ্লোকদ্বয় একই বৈদিক ঋষির বাণী? লেখকের ধারণা কবির পিতৃদেব 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' গ্রন্থে দুই মন্ত্রাংশ জুড়ে একত্রে ব্যাখ্যা করায় কবির মনে এই ধারণা জন্মায় যে দ্বিতীয় শ্লোকটি প্রথম শ্লোকেরই শেষাংশ। কবি দুই শ্লোক এক ভেবে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে এর যে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাও ঠিক হয়নি বলেই লেখকের বিশ্বাস। 'প্রাচীন ভারতে এক' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'এষাস্য পরমাগতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ' এষো অস্য পরমো লোক, এষো অস্য পরম আনন্দ'—এই বচনগুলির অর্থ করেছেন "সেই এক রহিয়াছেন—যিনি এই জীবের পরমাগতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরমলোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ"। লেখক বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মতে সংস্কৃত বচনটি পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ জীবের বর্ণনা। এটি ঠিক নয়, বচনটি পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন হলে সেই যোগের অবস্থার বর্ণনা। লেখক নিজের বক্তব্যের সমর্থনে অনেক যুক্তি প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আদেশ' শীর্ষক

প্রবন্ধে লিখেছেন "বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী, রোদসী বলেছে"। 'ভক্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন "ঋষি পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে 'ক্রন্দসী' নাম দিয়েছিলেন।" এ সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য যে সমগ্র বেদে এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে 'ক্রন্দসী' বলে কোন শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না, কোন অভিধানেও শব্দটি পাওয়া যায় না। ক্রন্দস্ বলে একটি শব্দ বেদে পাওয়া যায়, শব্দটি ক্লীব লিঙ্গ, প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে এর রূপ 'ক্রন্দসী', অন্তরীক্ষ অর্থে বেদে কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া গেল না। রাজশেখর বসুর চলন্তিকা অভিধানে ক্রন্দসী শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে 'আকাশ' বিকল্পে 'আকাশ ও পৃথিবী'। লেখকের মতে বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার দৃষ্টে এই অর্থটি রাজশেখরের স্বকল্পিত (ঐ শুন দিকে দিকে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—উর্বশী, রবীন্দ্রনাথ)।

'রোদসী' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য বেদে এই শব্দ আছে, পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যেও এটি ব্যবহৃত হয়েছে তবে অন্তরীক্ষ অর্থে কোথাও এর প্রয়োগ হয়নি। বেদে 'দ্যাবা পৃথিবী' মরুৎ পত্নী' অর্থে এর ব্যবহার আছে। লেখকের তিনটি মাত্র সংশয় কুণ্ঠিত নিবেদনের আলোচনা করা হল, এই ধরণের আরও ৩০টি বিষয় নিয়ে লেখক ১৯২ পৃষ্ঠা ব্যাপী বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনান্তে একটি 'অতিরিক্ত নিবেদন'ও সংযোজিত হয়েছে। লেখক এখানে বলেছেন—"এই গ্রন্থে কোথাও বেদ বেদান্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি ভ্রান্ত হিসাবে আলোচিত হয় নি। যে সব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্ত মত যথার্থ নয় বলে সংশয় হয়েছে এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে, কেবল সেগুলিই আলোচিত হয়েছে গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুধী-সমাজের বিবেচনার্থে। এই আলোচনা বাহুল্যই মনে হয়েছে, কারণ এমনই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর অসাধারণ রচনা-শক্তি সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর ব্যক্ত মতই বেদবাক্য।"

বাংলা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন টীকাকারগণের বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় এই বইটিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আকর গ্রন্থের শ্লোক ও বিষয়বস্তুকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে মণ্ডিত করে প্রকাশ করে গিয়েছেন এ বিষয়ে তাঁর ত্রুটি বা শৈথিল্য ঘটেছে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টাকে কোন মতেই তাঁর প্রতি অভক্তি ও ছিদ্রান্বেষণ প্রবণতা দোষ-দুষ্ট বলা যায় না। বর্তমান গ্রন্থ-লেখক দোষোদ্‌ঘোষণ করতে চাননি। তাঁর সংশয়গুলি এই আশায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যাতে সুধীজনের এই সমীক্ষায় এই সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। গ্রন্থকারের নিবেদন থেকে জানা গেল তিনি চুরাশী বৎসর বয়স্ক। আলোচ্য গ্রন্থের এটি প্রথম খণ্ড, তিনি এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশেরও প্রস্তুতি নিয়েছেন। লেখকের রবীন্দ্র-চর্চার সততা ও অধ্যবসায় অশেষ প্রশংসার যোগ্য। প্রকৃত রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকেরা বইটি পড়ে মুগ্ধ হবেন। রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুরের মূর্তি গড়ে তাঁর মূর্তির সামনে নাকি আজকাল পূজো দেওয়া হয়, এই রবীন্দ্র-পূজকেরা এই বই পড়ে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। এ বই অবশ্য তাঁদের জন্য নয়। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনার অন্যান্য পুস্তকের মতই বইটি সুমুদ্রিত ও শোভন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা ॥ সন্তোষকুমার অধিকারী, পরিবেশক—কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ; পৃঃ ৮০, মূল্য ৪·০০।

আত্ম-বিস্মৃত বাঙালী জাতি যে সামান্য সংখ্যক মহাপুরুষের স্মৃতি এখনও সযত্নে মনে রেখেছে তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রচারক বিদ্যাসাগরের আর একটি মহৎ গুণ ছিল লোক হিতৈষণা। বই লিখে ও বই ছাপিয়ে তাঁর প্রচুর আয় হত তথাপি তাঁকে জীবনের বিভিন্ন সময়ে পরদুঃখমোচনের জন্য বহু ঋণ করতে হয়েছিল এই ঋণ তিনি অবশ্য জীবদ্দশায় শোধ করে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। দারিদ্র, কুসংস্কার, অনিষ্কার বিরুদ্ধে তাঁকে যে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল সেই সূত্রে তাঁকে বহুলোকের ব্যক্তিগত শত্রুতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যাঁদের উপকারের জন্য তিনি জীবন-পাত করেছিলেন সেই বন্ধুবান্ধবও আত্মীয়-স্বজনেরাও তাঁকে আঘাত করতে দ্বিধা করেনি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র অপমানিত হয়ে চিরকালের জন্য স্বগ্রাম বীরসিংহ ত্যাগ করেন। ভাইদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছিল। একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্যাগ করেন। স্ত্রীর সঙ্গেও শেষ জীবনে তাঁর সম্পর্ক সুখময় ছিল না।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে ঈশ্বরচন্দ্র নিজ হাতে সাত পৃষ্ঠায় তাঁর বিষয় সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থার জন্য একটি উইল প্রস্তুত করেন। উইলে ৪৫ জনকে নির্দিষ্ট হারে মাসিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এর মধ্যে অন্তত ২৬ জন ছিল অনাত্মীয় দুঃস্থ। শেষ ইচ্ছাপত্র উইলে নিজের পরিচারক বর্গের জন্য ও গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষদের জন্যও তিনি ভাতার ব্যবস্থা করেন। গ্রামের নিজ প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয় ও ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্যও তিনি এই উইলে অর্থের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আটজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উইলে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। তিনজনকে তিনি এই উইলের কার্যদর্শী বা Exceuter নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগরের এই উইলের দুটি অনুচ্ছেদে পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে তিনি তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কারণ বর্ণনা করে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দেন যে তিনি কোনদিন তাঁর উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হবেন না, উইলের কার্যদর্শী বলেও পরিগণিত হতে পারবেন না। এই উইল লেখার পর বিদ্যাসাগর আরও ষোল বছর বেঁচে ছিলেন কিন্তু এই উইলের একটি শব্দও তিনি পরিবর্তন করেন নি। "যথেচ্ছাচারী ও কুলথ্যাগী" পুত্রকে ক্ষমা করা দয়ার-সাগর বিদ্যাসাগরের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙলা জীবন চরিত লিখিত হয়েছে, এদের কল্যাণে বিদ্যাসাগরের উইলের বিষয়বস্তু পাঠকদের পরিচিত। তবে এই উইলের পরিণতি কি হয়েছিল সেই সম্বন্ধে এই বইগুলি থেকে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার অধিকারীর আলোচ্য বইটি 'বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা'য় বিদ্যাসাগরের উইলের পরিণতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে যা অন্যত্র দুর্লভ। বিদ্যাসাগর জীবনী সাহিত্যে বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সঙ্কলন। সন্তোষকুমারের এই বইটি থেকে জানা গেল যে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মহাপ্রয়াণের পর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ আগষ্ট অন্যতম কার্যদর্শী (এক্সিকিউটর) ক্ষীরোদনাথ সিংহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উইলের প্রোবেট নেন। অপর দুই কার্যদর্শী একজনের মৃত্যু হয়েছিল আর

একজন কার্যদর্শী থাকতে অনিচ্ছুক হন। এর পর বিদ্যাসাগরের উইলের বৈধতার বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র ও পৌত্রের তরফ থেকে একটি মামলা হয়। বিচারকের নির্দেশে উইলের সাক্ষীদের আবার ডাকা হয়, এর মধ্যে অনেক সাক্ষী মারা গিয়েছিলেন। সাক্ষীরা বিচারকের কাছে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলেন। অতঃপর বিচারপতি এই মত প্রকাশ করেন যে বিদ্যাসাগরের উইলটি দান বা gift নয়। অতএব নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর সমস্ত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হবেন। সন্তোষবাবু লিখেছেন "সকল সম্পত্তির অধিকার লাভ করলেও নারায়ণচন্দ্র উইলে উল্লিখিত ব্যক্তিদের এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট হারে বৃত্তি ও মাসোহারা দিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এড়াতে পারেন নি। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল বৃত্তির টাকা অনেকেই পাচ্ছে না, এমনকি বীরসিংহে প্রতিষ্ঠিত ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক অনুদানও তিনি বন্ধ করে দেন।" এরপর কয়েকজন বৃত্তিভোগী ও ভগবতী বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নারায়ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা হয়। ইতিমধ্যে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রায় সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক অথবা হস্তান্তর করে ফেলেছিলেন। এরপর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট হাইকোর্ট বিদ্যাসাগরের সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, আয় ও ব্যয় নির্বাহের জন্য একজন রিসিভার নিযুক্ত করেন। সম্পত্তির আয় থেকে নারায়ণচন্দ্র, তৎপত্নী ভবসুন্দরী ও পুত্র প্যারীমোহনকে কিছু মাসিক ভাতা নেওয়ার ক্ষমতা রিসিভারকে দেওয়া হয়। নারায়ণচন্দ্রও তৎপত্নী কর্তৃক কৃত ঋণ শোধের জন্য বিদ্যাসাগরের বাড়ী ও গ্রন্থাগার বিক্রি করে দেওয়ার অধিকারও রিসিভারকে দেওয়া হয়েছিল এবং তা করাও হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা—বইটি লিখে বাঙালী পাঠককে উপহার দেওয়ার জন্য লেখক সন্তোষকুমার অধিকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ। এই বই বিদ্যাসাগর চর্চার সহায়ক হবে সন্দেহ নেই। তবে এই বইটি পাঠ করা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। একটি মহৎ মানুষের মহৎ ইচ্ছার এই করুণ পরিণতি পাঠকের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত